শক্তির উৎস

কানাইলাল মুখোপাধ্যায়

বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা

শক্তির উৎস

কানাইলাল মুখোপাধ্যায়

জি জ্ঞা সা
কলিকাতা ৯ ॥ কলিকাতা ২৯

VICHITRA-VIDYA-GRANTHAMALA : 35
SAKTIR UTSA
By Kanailal Mukhopadhyay

প্রথম প্রকাশ
১৫ই আগস্ট, ১৯৮৬

প্রকাশক
জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন (প্রা.) লি.
১এ কলেজ রো
কলিকাতা ৯

পরিবেশক
জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ লিমিটেড
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৯
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর
কালাচাঁদ ঘোষ
বাণী আর্ট প্রেস
৩১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

১.১

ভূমিকা

ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি পৃথিবীতে কয়লা এবং পেট্রোলিয়ামের ভাণ্ডার শেষ হতে নাকি আর বেশী দিন নেই। তখন থেকে মনে বড় শঙ্কা ছিল, শেষ হলে কি হবে? আমাদের শক্তির চাহিদা কোথা থেকে এবং কিভাবে পূরণ করবো? সব স্তব্ধ হয়ে যাবে। তাই আমাদের দশা কি হবে? পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে শক্তি সংকটের সঙ্গে সভ্যতারও সংকট উপস্থিত হয়েছে এবং শক্তির প্রাচুর্যের সঙ্গে লোকসংখ্যা এবং সভ্যতা বেড়েছে সমান তালে।

আমাদের শক্তির প্রধান জোগানদার হলো কয়লা, পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস এবং এগুলির নতুন নতুন সঞ্চয় আমরা যতই আবিষ্কার করি না কেন, এক-দিন না একদিন এইসব জীবাশ্ম জ্বালানির ভাণ্ডার শেষ হবেই হবে। তাই সভ্যতাকে সচল রাখবার জন্য বিকল্প শক্তির উৎসের সন্ধান এবং উন্নতি আমাদের করতেই হবে। 'শক্তির উৎস' নামে এই বইয়ে স্বল্প কথায় শক্তির নানা প্রকার উৎসের সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এই আলোচনায় প্রত্যেকটি উৎসের সুবিধা অসুবিধা এবং বিশেষ করে দূষণের কথা এসে পড়ে। প্রাসঙ্গিক আরো অনেক কিছু এসে পড়ে—যেমন, শক্তি ও রাজনীতি, শক্তি ব্যবহারের ইতিহাস, শক্তি সংরক্ষণ, শক্তির বাহক ইত্যাদি। শক্তি ও রাজনীতি সযত্নে বাদ দিয়েছি। শক্তি ব্যবহারের ইতিহাস, শক্তির সংরক্ষণ ও বাহক ইত্যাদি নিয়ে অল্প কথায় আলোচনা করেছি। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে শক্তি এটাও বাদ দিয়েছি।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয়ের আমার প্রাক্তন সহকর্মী অধ্যাপক প্রসাদ সেনগুপ্ত (বর্তমানে ঝাড়গ্রাম রাজকলেজের অধ্যাপক) শক্তি সংক্রান্ত নানান পত্রপত্রিকা আমাকে দিয়ে শক্তি বিষয়ক বই লেখাতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন। পরে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেণ্টার (কলকাতা) ও বারাসাত রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর সাহায্যে বইটির পাণ্ডুলিপি শেষ করি। পাণ্ডুলিপির কয়েকটা অধ্যায় পড়ে অধ্যাপক সেনগুপ্ত অনেক পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করার জন্য আমাকে পরামর্শ দেন। প্রকাশকের অভাবে পাণ্ডুলিপিটি অনেকদিন পড়ে ছিল। পরে অধ্যাপক সেনগুপ্তের সহধর্মিনী শ্রীমতী সুমিত্রা সেনগুপ্ত (বালিগঞ্জ গভঃ স্কুলের শিক্ষিকা) 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশক সংস্থার সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে

দেন। তাই সেনগুপ্ত দম্পতির কাছে ঋণ পরিশোধ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। নানা রকম সাংসারিক কাজকর্মের মধ্যেও এই বইয়ের পাণ্ডুলিপিটি সুন্দর করে কপি করে দিয়েছে আমার ছোট বোন শ্রীমতী রত্না সান্যাল। এই বইয়ের প্রুফ দেখেছেন শ্রীমানিকচন্দ্র দে। এদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

জিজ্ঞাসা প্রকাশক সংস্থার পক্ষে এই বইয়ের নিরীক্ষক ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের অধ্যাপক, শ্রীপ্রমথনাথ পাত্র। তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

আষাঢ় ১৩৯৩।

কানাইলাল মুখোপাধ্যায়

অগ্রজ

৺গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের

উদ্দেশে

সূচীপত্র

সূচনা

কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি (energy)* বলে। কোন বাধার বিরুদ্ধে কোন কিছুর স্থান পরিবর্তন এই শক্তি দ্বারাই হয়ে থাকে। এখানে 'কোন কিছুর' অর্থ হলো এমন কিছু যার ভর আছে। এই বাতাস, জল, পাথর, রেলগাড়ী, বিমান, পাখী ইত্যাদি ইত্যাদি এই 'কোন কিছুর' উদাহরণ। এই কোন কিছুর মধ্যে অবশ্যই মন নামক বস্তুটি (?) পড়বে না। কারণটা খুবই সোজা—মনের কি কোন ভর আছে?

এখন এই 'কাজ' বিভিন্নভাবে করা যেতে পারে এবং এই রূপভেদে এক এক রকম শক্তির সংজ্ঞা এক এক রকম হয়। গতিশীল বস্তুর শক্তি আছে। কারণ এটিকে থামাতে গেলে কাজ করতে হয়। বোমা বিস্ফোরণে অনেক বস্তুর স্থানচ্যুতি ঘটে এবং এর সঙ্গে তাপ, আলো এবং শব্দের সৃষ্টি হয়। এর থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বোমায় শক্তি নিহিত আছে। ইঞ্জিন সচল হলে কাজ করে। ইঞ্জিনকে সচল করতে চাই বাষ্প বা বিদ্যুৎ বা পেট্রোলিয়াম জাত বস্তুর দহনে উৎপন্ন তাপ। আবার বাষ্প করতে চাই তাপ। সুতরাং তাপ হলো এক ধরনের শক্তি। সেই রকম বিদ্যুৎ হলো আর এক ধরনের শক্তি। কারণ বিদ্যুৎ দিয়েও কাজ করান যায়। চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে স্থানচ্যুত করতে পারে, অর্থাৎ কাজ করতে পারে। সুতরাং চুম্বক শক্তিও শক্তির একটি রূপ।

যান্ত্রিক শক্তি হিসেবে শক্তিকে মাপা হয়। কাজের ন্যায় শক্তিও একটি স্কেলার রাশি (scalar quantity) এবং কাজকে যে একক দিয়ে মাপা হয় শক্তিকেও সেই একক** দিয়ে মাপা যায়। যেমন জুল, আর্গ, ওয়াট-ঘণ্টা, ফুট পাউন্ড বা ফুট পাউন্ডাল। আর কাজ করার হারকে ক্ষমতা** (power) বলে। ওয়াট (watt) এবং অশ্বশক্তি দিয়ে ক্ষমতাকে প্রকাশ করা হয়।

শক্তির রূপ ও রূপান্তর

নানারকম রূপে শক্তি থাকতে পারে বা শক্তি অনেক রূপে থাকতে পারে। যেমন কোন বস্তুর গতির জন্য যে শক্তির উদ্ভব হয় তাকে গতি শক্তি বলে। কোন বস্তুর অবস্থানের জন্য যে শক্তির উদ্ভব হয় তাকে স্থিতি শক্তি বলে। রাসায়নিক বস্তুর

* Energy কথাটা গ্রীক শব্দ 'energia' থেকে এসেছে, যার মানে 'in work'

** পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

আন্তর শক্তি (internal energy) থাকে। যার থেকে বিভিন্ন উপায়ে কার্যোপযোগী শক্তি পাওয়া যেতে পারে। যেমন কয়লাকে পোড়ালে যে শক্তি পাই, সেটা রাসায়নিক শক্তি বা রাসায়নিক বিক্রিয়া জনিত শক্তি।

এইরকম নানারূপে শক্তি থাকতে পারে এবং শক্তির বিভিন্ন রূপ হলো (i) গতি শক্তি (kinetic energy), (ii) স্থিতি শক্তি (potential energy), (iii) তাপ শক্তি (heat energy), (iv) বিদ্যুৎ শক্তি (electrical energy), (v) পারমাণবিক শক্তি (atomic energy), (vi) রাসায়নিক শক্তি (chemical energy), (vii) আলোক শক্তি (light energy), (viii) ধ্বনি শক্তি (sound energy), (ix) যান্ত্রিক শক্তি (mechanical energy), (x) চুম্বক শক্তি (magnetic energy), (xi) ভর (mass)।

শক্তির একটি রূপ থেকে অন্যরূপে পরিবর্তন করার প্রক্রিয়াকে শক্তির রূপান্তর (energy conversion) বলে। প্রকৃতিতে শক্তির রূপান্তর নানাভাবে হচ্ছে এবং একটা সাধারণ ব্যাপার। যেমন সৌর শক্তির প্রভাবে জল বাষ্পীভূত হয়, বাতাস বইতে থাকে, সমুদ্র স্রোতের সৃষ্টি হয়। আবার সালোক সংশ্লেষণের (photo synthesis) দ্বারা সৌর শক্তির একটা অংশকে গাছ আবদ্ধ করে রাখে তার নিজের শরীরে (পাতা, ছাল, কাণ্ড, শিকড়, ফল ইত্যাদিতে)। জীবাশ্ম জ্বালানিতেও সৌর শক্তির একটা অংশ আবদ্ধ থাকে। সূর্যে এবং বিভিন্ন নক্ষত্রে তাপ-নিউক্লীয় সম্মিলন বিক্রিয়ার মাধ্যমে তাপ শক্তি সৃষ্টি হয়।

মানুষ তার কারিগরী জ্ঞান দিয়ে শক্তির রূপান্তর নানাভাবে করে থাকে তার নিজের প্রয়োজনে; যেমন কয়লা বা অন্য কোন জীবাশ্ম জ্বালানির দহনে যে রাসায়নিক শক্তি মুক্ত হয় (অর্থাৎ তাপ শক্তি) তা দিয়ে জলকে বাষ্পে পরিণত করা যায়। আর এই বাষ্প দিয়ে ইঞ্জিনকে সচল করা যায়। বাষ্পীয় শক্তি দিয়ে চাকা ঘুরিয়ে গতি শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় বা বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।

এই বিদ্যুৎ শক্তিকে তাপ, আলো, যান্ত্রিক, রাসায়নিক, চুম্বক ইত্যাদি শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। ফটো ইলেকট্রিক সেলে আলো বিদ্যুতে রূপান্তরিত হয়। আবার তড়িৎ কোষে বা ব্যাটারীতে রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুতে পরিণত হয়। শক্তির রূপান্তরের এই রকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

শক্তির রূপান্তর করতে গেলে তাপগতি বিজ্ঞানের (thermodynamics) কতকগুলি নিয়ম নীতি এবং শর্ত মেনে চলতে হয়। যেমন রূপান্তরিত শক্তির পরিমাণ কখনই ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ থেকে বেশী হতে পারবে না। অর্থাৎ শক্তি সংরক্ষণ সূত্র মেনে চলতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে শক্তির রূপান্তর 100% হলেও, অনেক ক্ষেত্রে দক্ষতা অনেক কম হয়।

একটি শক্তিকে অন্য শক্তিতে রূপান্তর করতে মধ্যবর্তী অনেকগুলি রূপান্তরের ধাপ থাকতে পারে। প্রতি ধাপের দক্ষতা 100% না হলে অন্তিম ধাপের দক্ষতা অনেক কম হবে। তাই মধ্যবর্তী পর্যায় যত কমানো যাবে অন্তিম পর্যায়ের দক্ষতা তত বাড়বে। অধুনা শক্তির রূপান্তরের এই দিকটায় বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

ভর ও শক্তি

কাজ করার সামর্থ্যকে 'শক্তি' বলে। শক্তির এই সংজ্ঞা আজকাল আর চলে না। কারণ যে কোন রূপের শক্তি থেকে যে সব সময় কাজ পাওয়া যাবে এমন নয়। তাই আজকাল শক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় আইনস্টাইনের বিখ্যাত ভর শক্তি (mass energy) সমীকরণ দিয়ে।

$E=mc^2$ যেখানে E=শক্তি, m=ভর, c=আলোর গতি।

এই সমীকরণ দিয়ে এটাই বোঝান হয় যে, m ভর বিশিষ্ট কোন বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারলে তার থেকে যে শক্তি পাওয়া যাবে তার পরিমাণ হবে ঐ বস্তুর ভর (m)-কে আলোর গতির বর্গ দিয়ে গুণ করলে যা হয় তাই। যেহেতু আলোর গতি (3×10^8 মিটার/সেকেণ্ড) প্রচণ্ড, অতএব অল্প পরিমাণ ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারলে প্রচুর পরিমাণে শক্তি পাওয়া যাবে। কিন্তু ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা সহজ নয়। এক কিলোগ্রাম কোন বস্তুকে সম্পূর্ণ শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারলে মোট শক্তি (E) পাওয়া যাবে।

$$E=1\times(3\times10^8)^2 \text{ জুল বা } 9\times10^{16} \text{ জুল}$$

ভর ও বিকিরণ শক্তি হিসেবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মোট শক্তির পরিমাণ আনুমানিক $4{\cdot}5\times10^{58}$ kWh বলে কেউ কেউ মনে করেন।

শক্তি সংরক্ষণ

'শক্তির সৃষ্টি বা ধ্বংস অসম্ভব'। অবশ্য শক্তির একটি রূপকে অন্যরূপে পরিবর্তন সম্ভব। এটাই হলো শক্তি সংরক্ষণের সূত্র, যা তাপগতি বিজ্ঞানের প্রথম সূত্রও বটে।

এই প্রথম সূত্রকে অন্যভাবেও প্রকাশ করা যায়। যেমন 'শক্তি খরচ ছাড়া কোন যন্ত্র থেকে অবিরাম গতিতে (perpetual motion) কাজ পাওয়া সম্ভব নয়!' যন্ত্র থেকে কাজ পেতে গেলে উপযুক্ত শক্তি ব্যয় করতেই হবে। যান্ত্রিক শক্তি বা যন্ত্র থেকে পাওয়া কাজ ব্যয়িত তাপ শক্তি বা শক্তির সঙ্গে সমানুপাতিক।

দক্ষতা

কোন ইঞ্জিনে যে পরিমাণ শক্তি জোগান হয় ইঞ্জিন তার একটা অংশকে কাজে লাগায় বা কাজে রূপান্তরিত করতে পারে। অবশিষ্ট শক্তি চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে

নষ্ট হয়। এই ছড়িয়ে পড়া শক্তি থেকে কাজ পাওয়া যায় না এবং এটি পারিপার্শ্বিকের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে। কোন ইঞ্জিন মোট শক্তির শতকরা যতভাগ কেবল কাজের জন্য ব্যয় করে, তাকে ঐ ইঞ্জিনের দক্ষতা বলে। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের দক্ষতা সাধারণত 30—35% হয় অর্থাৎ ঐ ইঞ্জিনে মোট শক্তির মাত্র 30—35% কাজের জন্য ব্যয় হয় এবং অবশিষ্ট 65—70% শক্তি পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

শ ক্তি র উ ৎ স

সভ্যতা যত প্রসার লাভ করবে আমাদের শক্তির প্রয়োজনও তত বাড়বে। যান্ত্রিক শক্তি, তাপ ও আলোর জন্য প্রধানত আমাদের শক্তির প্রয়োজন। এছাড়া গাছ ও সকল প্রাণী তাদের শারীরিক প্রয়োজনে চায় শক্তি এবং খাদ্য তাদের এই শক্তি জোগায়। অর্থাৎ খাদ্য হলো এ ক্ষেত্রে শক্তির উৎস। শক্তির উৎস আলোচনায় খাদ্যকে আলোচনা করবো না।

সভ্যতাকে সচল রাখতে চাই শক্তির জোগান এবং তার জন্য প্রয়োজন শক্তির উৎস। শক্তির উৎস নির্বাচনের জন্য বর্তমানে কতকগুলি ব্যাপারের ওপর বিশেষ নজর দিতে হয়। শক্তির উৎস যে সব সময় জ্বালানিই হতে হবে তার কোন মানে নেই। যেমন জল শক্তিও শক্তির একটি উৎস, কিন্তু এটাকে কি আমরা জ্বালানি বলবো? সেই রকম বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্র-স্রোত, সৌর রশ্মি ইত্যাদি শক্তির উৎস হলেও এগুলি জ্বালানি নয়। তাহলে জ্বালানি কাদের বলবো? রাসায়নিক বা পারমাণবিক বিক্রিয়া দিয়ে যে বস্তু থেকে শক্তি বার হবে তাকে বলবো জ্বালানি। এই ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো দহন, যা কয়লা, পেট্রোলিয়াম বস্তুসামগ্রী, প্রাকৃতিক গ্যাস, কাঠ, কোহল ইত্যাদির জারণকে সাধারণত বলা হয়। হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড এবং হাইড্রাজিনের দহনও খুব দ্রুত হয়। এগুলিও জ্বালানি এবং রকেট জ্বালানি হিসেবে লাগে। ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম, থোরিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীনের বিভাজনে (যাকে পারমাণবিক বিভাজন বলে) প্রচুর শক্তি বার হয়। এদের পারমাণবিক জ্বালানি বলে।

শক্তির উৎসটি সহজলভ্য এবং ভাণ্ডারটি ব্যাপক হওয়া দরকার। উৎসটি পুনর্নবীভবনযোগ্য (renewable) হলে সবচেয়ে ভালো হয়। এই প্রসঙ্গে যে কথাটা বলে রাখা প্রয়োজন তা হলো সৌর শক্তি (যার উৎস হলো সৌর রশ্মি) হলো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বিকিরণমাত্র। সূর্যরশ্মি পদার্থ বাহিত নয়। তাছাড়া যে কোন শক্তির উৎসের সঙ্গে পদার্থের একটা সম্পর্ক আছে। সোজা কথায় অন্যান্য শক্তির উৎস হবে ভর বিশিষ্ট, যা সব সময় যে কঠিন হতে হবে এমন নয়। তরল ও গ্যাসীয়

অবস্থাতেও থাকতে পারে। যেমন কয়লা, কাঠ হলো কঠিন, পেট্রোলিয়াম হলো তরল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস বায়বীয়।

শক্তির উৎসটি যে স্থানে যে অবস্থায় পাওয়া যায় সেখান থেকে তাকে আহরণ করা, তার থেকে ব্যবহারের উপযোগী অবস্থায় আনা এবং শক্তি উৎপাদনের কলা-কৌশল বা কারিগরী প্রযুক্তিটা উন্নত হওয়া দরকার। যেমন পেট্রোলিয়াম একটি শক্তি-উৎস। এই উৎসের সন্ধান করা, পেট্রোলিয়ামের খনি থেকে কাঁচা পেট্রোলিয়াম তোলার পর পরিশোধন করার জন্য চাই উন্নত প্রযুক্তি, সেটা আমাদের জানা আছে।

প্রযুক্তিটা যত উন্নত হবে তত ভালো মানের শক্তির উৎস বা জ্বালানি পাওয়া যাবে। ফলে উৎপন্ন শক্তির দাম কম পড়বে।

শক্তির উৎসকে জ্বালানি ও অজ্বালানি এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। জ্বালানিকে ভাগ করা যায় (i) জীবাশ্ম জ্বালানি (fossil fuel), (ii) অজৈব জ্বালানি (inorganic fuel), (iii) জৈব ভর জ্বালানি (biomass fuel), (iv) পারমাণবিক জ্বালানি (nuclear fuel)।

অজ্বালানি শক্তির উৎসকে ভাগ করা যায় (i) সৌর রশ্মি, (ii) বায়ুপ্রবাহ, (iii) সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটা ও স্রোত, (iv) সমুদ্রস্তরের তাপমাত্রার পার্থক্য, (v) ভূ-তাপ, (vi) জল শক্তি, (vii) মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের পেশীর শক্তি।

শক্তির উৎসের বৈশিষ্ট্য

যে উৎস থেকেই শক্তি পাওয়া যাক না কেন, নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির ওপর নজর রাখা হয়।

(i) উৎপাদন ব্যয় কম হওয়া এবং প্রযুক্তিটা যতটা সম্ভব সরল ও সোজা হওয়া দরকার, অর্থাৎ সহজলভ্য। (ii) ভাণ্ডারটি পর্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। (iii) যে কোন রকম কাজে ঐ শক্তিকে ব্যবহার করতে পারলে ভালো। (iv) শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়াটি সরল ও নিরাপদ হওয়া দরকার। (v) প্রাপ্ত শক্তির পরিবহণ, বণ্টন ও সংরক্ষণ সহজতর হওয়া বাঞ্ছনীয়। (vi) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা চাই। (vii) উৎসের অবস্থান থেকে শক্তি উৎপাদন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে যেন পরিবেশ দূষিত না হয় বা যতটা সম্ভব কম হয়।

এখন শক্তির উৎস যেন বামুনের গরু। এমন উৎস পাওয়া সম্ভব নয় যাতে প্রত্যেকটি গুণই আছে। তবে এই সকল বৈশিষ্ট্যের কাছাকাছি গুণ থাকলেই চলবে। যেমন ধরা যাক কয়লার কি কি গুণাগুণ আছে—(i) সকল দেশে পাওয়া যায় না এবং এটি পুনর্নবীভবনযোগ্য উৎস নয়। (ii) খনি থেকে তুলে

পরে ব্যবহারের উপযোগী করে নেওয়ার প্রযুক্তিটি ভালোভাবে জানা আছে। (iii) এর থেকে সহজে তাপ পাওয়া যায় এবং যার থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও অন্যান্য অনেক কাজ করা সহজ। (iv) কয়লাকে সহজে সংরক্ষণ করা যায়, তবে পরিবহণে ব্যয় আছে। (v) কয়লা থেকে শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়াটি সহজ ও নিরাপদ, কিন্তু পরিবেশ দূষণের ব্যাপারটা খুবই চিন্তার কারণ।

ভূতাপ শক্তির গুণাগুণ হলো—(i) সব জায়গায় পাওয়া যায় না। (ii) প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন সহজ ব্যাপার নয়। (iii) তবে ভাণ্ডারটি অফুরন্ত। (iv) অনেক দূরে পরিবহণে অনেক অসুবিধা আছে। (v) এর থেকে পরিবেশ দূষণ প্রায় হয় না বললেই চলে। (vi) সহজে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়।

কয়লা

ধূসর থেকে কালো রঙের পাথরের মত দেখতে যে প্রাকৃতিক বস্তুর বেশীর ভাগটা কার্বন দিয়ে গঠিত তাকে কয়লা (coal) বলে। কয়লা খনিতে পাওয়া যায়। কয়লার খনি স্থলভাগে এবং সমুদ্র দরিয়ায় থাকতে পারে।

আজ থেকে প্রায় ত্রিশ কোটি বছর আগে কার্বনীফেরাস (carboniferous) যুগে জলা জায়গায় যে গাছ জন্মাত তা কালক্রমে মাটির তলায় চাপা পড়ে গিয়ে প্রচণ্ড চাপে এবং লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নানান ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে গ্রাফাইট বা গ্রাফাইটের মত যে পদার্থের সৃষ্টি হয়েছিল তাকেই আমরা কয়লা বলি। গাছের শরীরের এই ভূ-তাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে কয়লার সৃষ্টির সঙ্গে অন্যান্য হাইড্রোকার্বন এবং বিশেষ করে মিথেনের উৎপত্তি হয়। প্রতি টন ভূগর্ভস্থ কয়লা থেকে প্রায় 200 ঘন ফুট মিথেন পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যে পরিমাণ কয়লা আছে বলে হিসাব করা হয়েছে তার থেকে যে পরিমাণ মিথেন পাওয়া যাবে তার আয়তন প্রায় 1500×10^{12} ঘন ফুট। যা কিনা পৃথিবীর মোট প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় তিনগুণ। মিথেন বাতাসের সঙ্গে মিশে বিস্ফোরক মিশ্রণ সৃষ্টি করে এবং এর বিস্ফোরণে আগে কয়লা খনিতে প্রায়ই আগুন লেগে যেতো এবং এখনও মাঝে মাঝে আগুন লেগে যায়। আর এর জন্য মিথেনকে 'ফায়ার ড্যাম্প' (fire damp) বলা হয়। বিস্ফোরণ ও আগুন লাগার জন্য খনিগর্ভে যে দুর্ঘটনা ঘটে তাতে খনিগর্ভে কর্মরত লোকজনের হত আর আহত হওয়ার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ টন কয়লাও পুড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তাই বিস্ফোরণের হাত থেকে খনিকে বাঁচানোর জন্য এই মিথেন গ্যাসকে ইলেকট্রিক পাখার (exhaust) সাহায্যে টেনে বার করে বাতাসে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ভাবে কয়লাখনি অঞ্চলে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে মিথেন গ্যাসকে কাজে না লাগিয়ে নষ্ট করা হয়। অবশ্য আজকাল এই গ্যাসকে কাজে লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে। খনি থেকে প্রাপ্ত কয়লায় আবদ্ধ বা অচল (fixed) কার্বন এবং অন্যান্য উদ্বায়ী বস্তুর পরিমাণের ভিত্তিতে কয়লাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন লিগনাইট, সাব বিটুমিনাস, বিটুমিনাস এবং অ্যানথ্রাসাইট।

মানুষ এই কয়লার হদিশ অনেকদিন আগেই পেয়েছে। ব্রোঞ্জ যুগে (খ্রীঃ পূঃ প্রায় 2000) শবদাহতে এই কয়লা ব্যবহার করা হতো। ওল্ড টেস্টামেণ্টে কয়লার উল্লেখ পাওয়া যায়। যীশুর জন্মের আগে চীন দেশের লোকেরা উত্তাপের

জন্য কয়লা ব্যবহার করত। নবম শতাব্দী থেকে ইংলণ্ডে খনি থেকে কয়লা তোলা আরম্ভ হয়েছে এবং তারপর থেকে এবং পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের আগে পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে কয়লার ব্যবহার বেড়েই যেতে লাগলো। এই ইংলণ্ডেই দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রথম লোহার কাজে কয়লা ব্যবহার হয়। আর প্রায় ঐ সময় থেকেই কয়লা থেকে পরিবেশ দূষণের ব্যাপারটা মানুষের চোখে ধরা পড়ে। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলণ্ড থেকে প্রথম ফ্রান্সে কয়লা চালান যায়। 1709 খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে কয়লা থেকে প্রথম কোক প্রস্তুত করা হয় এবং 1710 খ্রীষ্টাব্দে খনি থেকে জল পাম্প করে বার করার কাজে বাষ্পীয় ইঞ্জিনে প্রথম কয়লা ব্যবহার হয়েছিল, এই অষ্টাদশ শতাব্দীতে এখানেই প্রথম মারুত চুল্লীতে কয়লা ব্যবহার করা হয়। 1792 খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডে উইলিয়াম মার্ডক প্রথম কোলগ্যাস দিয়ে তাঁর বাড়ী আলোকিত করেন। আর 1800 খ্রীঃ ইংল্যাণ্ডে কোলগ্যাস উৎপাদন হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শক্তি উৎপাদনের বেশীরভাগ ক্ষেত্র থেকে কয়লা কাঠকে হটিয়ে দেয়। 1856 খ্রীঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কোলটার বা আলকাত্রা শিল্পের আবির্ভাব হয়। 1890 খ্রীঃ ইংলণ্ডেই প্রথম সমুদ্র দরিয়া থেকে কয়লা তোলার ব্যবস্থা হয়েছিল। 1923 খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে ফিশার ট্রপস (Fischer Tropsch) পদ্ধতি দিয়ে কয়লা থেকে প্রথম তরল জ্বালানি প্রস্তুত করা হয়। 1914 খ্রীষ্টাব্দে পাইপ লাইন দিয়ে জলের সাহায্যে লণ্ডনে কয়লা পরিবহণ করা হয়েছিল। 1930 খ্রীঃ লার্জি পদ্ধতিতে কয়লা থেকে গ্যাসীয় ও তরল জ্বালানি প্রস্তুত করা হয়। আর এই সাল থেকেই প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার শুরু হওয়ায় কয়লার ব্যবহার কমতে শুরু করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে (1946-48) খনিগর্ভে কয়লাকে গ্যাসীভূত করার পরীক্ষা হয়। 1950 খ্রীঃ প্রথম রাশিয়ায় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালাতে কয়লা ব্যবহার করা হয়। 1976 খ্রীঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কয়লার তরলীকরণ প্ল্যাণ্টে প্রথম মিথানল উৎপাদন করা হয়েছিল।

প্রত্যেকটি মহাদেশেই কয়লা পাওয়া যায়। কিন্তু বিভিন্ন দেশে কয়লা প্রাপ্তির পরিমাণের মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে। পৃথিবীর ছটা দেশে কয়লার মজুদ ভাণ্ডার সবচেয়ে বেশী। এদের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্থান এক নম্বরে, দ্বিতীয় স্থানে আছে চীন এবং তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থানে আছে যথাক্রমে রাশিয়া, জার্মানী, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ব্রিটেন। প্রত্যেক দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। আমাদের ভারতেও কয়লা পাওয়া যায়, তবে তার পরিমাণ খুব একটা বেশী নয়। আবার ঐ কয়লা গুণগুণ বিচারে খুব উন্নত মানেরও নয়। ভারতে ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, ধানবাদ অঞ্চলে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। এছাড়া মধ্যপ্রদেশ, আসামেও কয়লা পাওয়া যায়। আর দক্ষিণ ভারতে প্রচুর পরিমাণে লিগনাইট পাওয়া যায়।

কয়লায় কি আছে? এটা জানার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ কয়লার ব্যবহার এর ওপর নির্ভর করে। বিশ্লেষণ করে যা জানা গেছে তাতে দেখা যায় যে, কয়লায় আছে আবদ্ধ বা অচল (fixed) কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O), নাইট্রোজেন (N), সালফার (S), ফসফরাস (P) এবং অনুদ্বায়ী খনিজ পদার্থ (যাকে ছাই বলা হয়)। এই ছাইয়ে কাদামাটি, কোয়ার্টজ বা বালি ছাড়াও ধাতব যৌগ উপস্থিত থাকে। এক এক শ্রেণীর কয়লায় ঐ সকল মৌলের এবং ছাইয়ের পরিমাণ এক এক রকম হয়।

অনেক সময় কয়লায় উপস্থিত জল, উদ্বায়ী বস্তু, আবদ্ধ কার্বন ও ছাইয়ের পরিমাণ দিয়ে কয়লার শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যে কোন জ্বালানির তাপমূল্য (calorific value) একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার এবং তাপমূল্যের ওপরও জ্বালানীর উপযোগিতা নির্ভর করে।

কয়লা মাটির নিচে চাপা থাকাকালীন চাপ ও তাপমাত্রার প্রভাবের ওপর কয়লার ভৌত ধর্ম ও রাসায়নিক সংযুতি নির্ভর করে। কয়লার কাঠিন্য, দৃঢ়ীভবন, রন্ধ্রতা ইত্যাদি ভৌত ধর্মগুলি চাপের ওপর নির্ভর করে। চাপ বলতে এখানে কয়লার ওপর যে ভূমিস্তর থাকে তার ওজনকেই বোঝান হয়। আর তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে কয়লায় কার্বনের শতকরা পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, এবং হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাণ কম হলে উদ্বায়ী বস্তুর পরিমাণও কম হয়। আর কার্বনের শতকরা পরিমাণ বৃদ্ধিতে কয়লার তাপমূল্য বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর যত গভীরে কয়লার অবস্থান হবে সেই কয়লার তাপমূল্য তত বেশী হবে। এছাড়া আগ্নেয়শিলার কাছে কয়লা থাকলে তার তাপমূল্য বেশী হয়। ভূগর্ভস্থ কয়লা স্তরের তাপমাত্রা বেশী হলে কয়লা কোক কয়লায় পরিণত হতে পারে। প্রকৃতিতে কোক কয়লা প্রাপ্তির ঘটনা খুব কম হলেও বিরল নয়।

কয়লায় আবদ্ধ কার্বনের পরিমাণ যত বাড়বে এবং অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও ছাইয়ের পরিমাণ যত কম হবে সেই কয়লার মান তত উঁচু হবে। সালফার ও জলের পরিমাণ যত কম হবে সেই কয়লা তত ভালো জাতের হবে। তাই অ্যানথ্রাসাইট কয়লার মান উঁচু এবং লিগনাইটের মান সবচেয়ে কম।

জীবাশ্ম জ্বালানির মধ্যে কয়লার স্থান এক নম্বরে আছে পরিমাণের দিক দিয়ে এবং মোট শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে। এই জ্বালানিটি গত প্রায় একহাজার বছর ধরে আমাদের শক্তি জুগিয়ে আসছে এবং গত দেড়শ বছরে এই জ্বালানির ব্যবহার সবচেয়ে বেড়েছে। পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কারের পর এই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার থেকে কয়লার ব্যবহার কমতে থাকলেও বর্তমানে পেট্রোলিয়ামের অপ্রতুলতার জন্য পুনরায় এই কয়লার কদর বাড়ছে। যে হারে আমাদের জ্বালানির

	আনুমানিক শতকরা পরিমাণ				বিশ্লেষণে প্রাপ্ত					তাপ
	H_2O	উদ্বায়ী পদার্থ	আবদ্ধ C	ছাই	C	H	N	O	S	BTh.U/ পাউণ্ড
অ্যান্থ্রাসাইট	4·4 —2·8	4·8— 4·9	81·8— 75·2	9— 10·1	79·8 —78·3	3·4— 3·7	1— 1·7	6·2— 4·0	0·6— 2·2	13,130 —13,360
বিটুমিনাস	2·3— 5·9	19·6— 43·8	65·8— 46·5	12·3— 3·8	74·5 —72·2	4·5— 5·7	1·4— 1·3	4·2— 14·0	3·1— 3·0	13,220 —13,150
সাববিটুমিনাস	13·9— 25·8	34·2 — 31·1	41·0— 38·4	10·9— 4·7	57·5 —50·0	6·2— 6·3	1·4— 0 6	23·4— 38·1	0·6— 0·3	10,330 —8,580
লিগনাইট	36·8	27·8	30·2	5·2	41·2	6·9	0·7	45·6	0·4	6,960

চাহিদা বাড়ছে তাতে পেট্রোলিয়ামের আয়ু আর বেশীদিন নয় এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের অবস্থাও তাই। ফলে আরো কিছুকালের জন্য আমাদের এই কয়লার ওপর ভরসা করতেই হবে, যতদিন না একটা উপযুক্ত এবং পর্যাপ্ত শক্তির উৎসকে খুঁজে পাই। পেট্রোলিয়াম জাত জ্বালানি এবং প্রাকৃতিক গ্যাস আমাদের ব্যবহারের জন্য যখন হাজির হলো তখনি কয়লার ব্যবহার কমেছে। তার কারণ কয়লা ব্যবহারের অনেক অসুবিধে আছে। সে যাই হোক কয়লাকে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করতে হলে, প্রথম কাজ হলো কয়লা খনি আবিষ্কার এবং ঐ খনি থেকে কয়লা তোলার ব্যবস্থা করা।

খনি থেকে কয়লা তোলার নানান পদ্ধতি আছে। যেমন কয়লা স্তর যেখানে ভূপৃষ্ঠের খুব নিকটে থাকে সেখানে ঐ কয়লা স্তরের ওপরের মাটি বা পাথর কেটে সরিয়ে ফেলে কয়লা তোলা হয়। এই উপায়ে কয়লা তোলাতে দুর্ঘটনার সংখ্যা খুবই কম। তবে এই পদ্ধতির প্রধান অসুবিধে হলো জমি নষ্ট হয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিঘ্ন ঘটে, ভূমি ক্ষয় হয় বেশী এবং বায়ুতে ধুলোবালির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ফলে বায়ু দূষণের মাত্রা খুব বেশী, তবে এই পদ্ধতিতে স্তরের পুরো কয়লাকে তোলা যায়।

কয়লার স্তর যখন ভূপৃষ্ঠের অনেক নীচে থাকে, তখন ঐ স্তরের ওপরে কোন এক জায়গায় বড় গর্ত করে কয়লার স্তর পর্যন্ত গিয়ে কয়লা কেটে ছোট ছোট ট্রলি করে ঐ খাদের মুখে নিয়ে এসে ওপরে তোলা হয়। এই পদ্ধতিতে ঐ স্তরের সমস্ত কয়লাকে কেটে তোলা যায় না। কারণ কয়লা স্তরের ওপর ভূমিস্তরের ভার রাখার জন্য ঐ কয়লা স্তরের মাঝে মাঝে থামের মত কয়লা স্তর রাখা হয়। কয়লা খনি থেকে কয়লা কাটা শেষ হয়ে গেলে খনির শূন্যস্থান বালি দিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হতে থাকে এবং ঐ কয়লার থামগুলি আস্তে আস্তে পর পর কেটে তুলে নেওয়া হয়।

এ ছাড়া খনি অভ্যন্তরে কয়লা স্তরে বিশেষ এক ধরনের দ্রাবক প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় এবং পরে ঐ কয়লার দ্রবণকে পাম্প করে ওপরে তুলে দ্রাবককে পৃথক করে কয়লাকে আলাদা করা হয়।

খনি থেকে কয়লা তোলার পর কয়লাকে পরিবহণ করে যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, যদি ঐ কয়লায় তেমন খুব একটা বেশী অশুদ্ধি না থাকে। কয়লায় যদি ছাই ও সালফারের পরিমাণ বেশী হয়, তবে ঐ কয়লাকে ব্যবহারের আগে ছাই ও সালফার যথাসম্ভব দূর করা হয়। এই কাজে কয়লা ও ছাইয়ের (যা কিনা অজৈব ধাতব যৌগ) আপেক্ষিক গুরুত্বের পার্থক্যের সাহায্যে কয়লাকে জল দিয়ে ধুয়ে ছাইয়ের থেকে আলাদা করা হয়। কয়লা জলে ভাসে আর ছাই ডুবে যায়। কয়লা

খণ্ডের আকার যত ছোট হবে তত ভালোভাবে ছাইকে আলাদা করা যাবে। বেশীর-ভাগ কাজে ব্যবহৃত কয়লা খণ্ডের আকার সাধারণত 3/8″ হয়। কয়লাকে ধোয়ার পর জল ঝরিয়ে শুকিয়ে নেবার পর পরিবহণ করে যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়লা পরিবহণে ট্রাক, রেলওয়াগন ব্যবহারের সঙ্গে পাইপ লাইন দিয়ে জলের সাহায্যে পরিবহণ করা হয়। কয়লাকে খুব সূক্ষ্ম গুড়োয় পরিণত করে জল দিয়ে ধুয়ে নিলে ছাইয়ের সঙ্গে সালফারও দূর হয়ে যায়। সালফার যুক্ত কয়লাকে পোড়ালে কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে সালফার ডাই-অক্সাইড বাতাসে চলে আসে। প্রতিদিন হাজার হাজার টন কয়লা পোড়ানোর দরুন বাতাসে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও সালফার ডাই-অক্সাইড চলে আসছে। এতে অ্যাসিড (সালফার ডাই-অক্সাইড ও জলের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন অ্যাসিড) বৃষ্টি হবে। ফলে জমির খনিজ পদার্থ অ্যাসিডে ধুয়ে চলে যাবে। তাতে ভূমিক্ষয় বাড়বে এবং জমিতে অ্যাসিডের পরিমাণ বৃদ্ধিতে গাছপালা জন্মাতে বাধা সৃষ্টি করবে। এতে বৃষ্টিপাত কমবে, মরুভূমির আগ্রাসন বাড়বে, ফলে তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থাপত্য বিনষ্ট হবে খুব তাড়াতাড়ি।

কয়লা তাপ উৎপাদনে, কয়লার কার্বনীকরণে (carbonisation), তরল ও গ্যাসীয় জ্বালানি প্রস্তুতিতে এবং ধাতু শিল্পে বিজারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কয়লা থেকে প্রাপ্ত তাপ প্রধানত বিদ্যুৎ উৎপাদনে, শিল্পের প্রয়োজনে, বাষ্প উৎপাদনে, রেল ও জাহাজ চালাবার জন্য অর্থাৎ পরিবহণে, শীত প্রধান দেশে ঘর গরম রাখতে ব্যবহৃত হয়। 1000 মেগাওয়াট তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য বছরে প্রায় ত্রিশলাখ টন কয়লা প্রয়োজন হয়।

কয়লার কার্বনীকরণের দ্বারা প্রাপ্ত একাধিক পদার্থ বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য খুবই প্রয়োজন। কার্বনীকরণ কাকে বলে? কয়লাকে বাতাসের অবর্তমানে কোন আবদ্ধ পাত্রে উত্তপ্ত করলে কয়লা থেকে তরল ও উদ্বায়ী পদার্থসমূহ পৃথক হয়ে যায় এবং পাত্রে যে কঠিন পদার্থ পড়ে থাকে তাকে কোক কয়লা বলে। কোক কয়লায় উদ্বায়ী পদার্থ না থাকায় আবদ্ধ কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়াকে কয়লার কার্বনীকরণ বলে। প্রাপ্ত তরল দুটো স্তরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ওপরের ঈষদ বাদামী রঙের তরলকে অ্যামোনিয়াক্যাল লিকার (ammoniacal liquor) এবং তলায় যে কালোরঙের চটচটে ভারী তরল পড়ে থাকে তাকে আলকাতরা বা কোলটার (coal tar) বলে। গ্যাসীয় পদার্থকে বিশুদ্ধ করার পর তাকে কোল গ্যাস বলে। যা গ্যাসীয় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কোল গ্যাসে মিথেন আছে 25-33%, কার্বন মনোক্সাইড 5-10%, হাইড্রোজেন 45-55%, অ্যাসিটিলিন, ইথিলিন এবং বেনজিন একত্রে 2·5-5·5%, নাইট্রোজেন 2-10%,

কার্বন ডাই-অক্সাইড 5% এবং অক্সিজেন 2%। কোল গ্যাসের তাপমূল্য প্রায় 550 B.Th.U প্রতি ঘন ফুটে। পুরানো কোলকাতার রাস্তায় গ্যাসবাতি এই কোল-গ্যাস দিয়ে জ্বালানো হতো। আর এই কোলগ্যাস প্রস্তুত করত ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানি কয়লার কার্বনীকরণ করে। কোলকাতায় রাস্তায় গ্যাসবাতি না থাকলেও বিভিন্ন শিল্পে, রান্নার কাজে এবং স্কুল কলেজে বার্নার জ্বালাতে আজও ব্যবহৃত হচ্ছে কোলগ্যাস। বর্তমানে এই গ্যাস দুর্গাপুর থেকে পাইপ লাইন দিয়ে কোলকাতায় আনা হয়।

অ্যামোনিয়াক্যাল লিকার থেকে অ্যামোনিয়া এবং অ্যামোনিয়াম সার প্রস্তুত করা হয়। কোক কয়লা ধাতু শিল্পে বিজারক হিসেবে এবং বিভিন্ন শিল্পে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমরা বাড়ীতে রান্নার জন্য যে কয়লা ব্যবহার করি আসলে তা কোক কয়লা। খনি থেকে তোলা কয়লাকে কাঁচা কয়লা বা পাথুরে কয়লা বলে।

কোলটার থেকে প্লাস্টিক, রং, দ্রাবক, নাইলন, ওষুধ, তরল জ্বালানি, কীটনাশক পদার্থ, কসমেটিক, টারপোলিন এবং বহু প্রকার জৈব যৌগ প্রস্তুত করা হয়। এছাড়া কাঠ সংরক্ষণে এবং পীচের রাস্তা তৈরীতে প্রচুর পরিমাণে কোলটার প্রয়োজন হয়। এখনও অনেক জায়গায় শুধুমাত্র কোক প্রস্তুতের জন্য কার্বনী-করণ করা হয় এবং এক্ষেত্রে কোলটার ও কোলগ্যাসকে জ্বালিয়ে তাপ উৎপাদনে ব্যবহার করা হয় বা নষ্ট করা হয়।

কার্বনীকরণ দুভাবে করা যায়—(i) কম তাপমাত্রায় কার্বনীকরণ এবং (ii) বেশী তাপমাত্রায় কার্বনীকরণ। কম তাপমাত্রায় কার্বনীকরণে তরল পদার্থের পরিমাণ বেশী হয় এবং বেশী তাপমাত্রায় কার্বনীকরণে তরল পদার্থের পরিমাণ কম হয়। কার্বনীকরণে দু ধরনের পাত্র ব্যবহার করা হয়—(ক) উল্লম্ব পাত্র, (খ) অনু-ভূমিক পাত্র।

ক য় লা র গ্যা সী ক র ণ

বাতাস, অক্সিজেন, জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাই-অক্সাইড বা এদের মিশ্রণের সঙ্গে কয়লার বা কোক বা কাঠকয়লার বিক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্যাসীয় জ্বালানির উৎপাদনকে কয়লার গ্যাসীকরণ বলে। উৎপন্ন গ্যাসীয় জ্বালানিতে কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন, মিথেন ইত্যাদির সঙ্গে অন্যান্য পদার্থও বর্তমান থাকে। কয়লার গ্যাসীকরণের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ওপর এই সকল উপাদানের অনুপাত নির্ভর করে। বাতাস বা অক্সিজেন মাধ্যমে কয়লা বা কোক বা কাঠকয়লার বিক্রিয়ায় উৎপন্ন তাপ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বিক্রিয়াটিকে দহন বলে। একে গ্যাসীকরণ বিক্রিয়া বলে না।

খণ্ডের আকার যত ছোট হবে তত ভালোভাবে ছাইকে আলাদা করা যাবে। বেশীরভাগ কাজে ব্যবহৃত কয়লা খণ্ডের আকার সাধারণত 3/8″ হয়। কয়লাকে ধোয়ার পর জল ঝরিয়ে শুকিয়ে নেবার পর পরিবহণ করে যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়লা পরিবহণে ট্রাক, রেলওয়াগন ব্যবহারের সঙ্গে পাইপ লাইন দিয়ে জলের সাহায্যে পরিবহণ করা হয়। কয়লাকে খুব সূক্ষ্ম গুড়োয় পরিণত করে জল দিয়ে ধুয়ে নিলে ছাইয়ের সঙ্গে সালফারও দূর হয়ে যায়। সালফার যুক্ত কয়লাকে পোড়ালে কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে সালফার ডাই-অক্সাইড বাতাসে চলে আসে। প্রতিদিন হাজার হাজার টন কয়লা পোড়ানোর দরুন বাতাসে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও সালফার ডাই-অক্সাইড চলে আসছে। এতে অ্যাসিড (সালফার ডাই-অক্সাইড ও জলের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন অ্যাসিড) বৃষ্টি হবে। ফলে জমির খনিজ পদার্থ অ্যাসিডে ধুয়ে চলে যাবে। তাতে ভূমিক্ষয় বাড়বে এবং জমিতে অ্যাসিডের পরিমাণ বৃদ্ধিতে গাছপালা জন্মাতে বাধা সৃষ্টি করবে। এতে বৃষ্টিপাত কমবে, মরুভূমির আগ্রাসন বাড়বে, ফলে তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থাপত্য বিনষ্ট হবে খুব তাড়াতাড়ি।

কয়লা তাপ উৎপাদনে, কয়লার কার্বনীকরণে (carbonisation), তরল ও গ্যাসীয় জ্বালানি প্রস্তুতিতে এবং ধাতু শিল্পে বিজারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কয়লা থেকে প্রাপ্ত তাপ প্রধানত বিদ্যুৎ উৎপাদনে, শিল্পের প্রয়োজনে, বাষ্প উৎপাদনে, রেল ও জাহাজ চালাবার জন্য অর্থাৎ পরিবহণে, শীত প্রধান দেশে ঘর গরম রাখতে ব্যবহৃত হয়। 1000 মেগাওয়াট তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য বছরে প্রায় ত্রিশলাখ টন কয়লা প্রয়োজন হয়।

কয়লার কার্বনীকরণের দ্বারা প্রাপ্ত একাধিক পদার্থ বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য খুবই প্রয়োজন। কার্বনীকরণ কাকে বলে? কয়লাকে বাতাসের অবর্তমানে কোন আবদ্ধ পাত্রে উত্তপ্ত করলে কয়লা থেকে তরল ও উদ্বায়ী পদার্থসমূহ পৃথক হয়ে যায় এবং পাত্রে যে কঠিন পদার্থ পড়ে থাকে তাকে কোক কয়লা বলে। কোক কয়লায় উদ্বায়ী পদার্থ না থাকায় আবদ্ধ কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়াকে কয়লার কার্বনীকরণ বলে। প্রাপ্ত তরল দুটো স্তরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ওপরের ঈষদ বাদামী রঙের তরলকে অ্যামোনিয়াক্যাল লিকার (ammoniacal liquor) এবং তলায় যে কালোরঙের চট্‌চটে ভারী তরল পড়ে থাকে তাকে আলকাতরা বা কোলটার (coal tar) বলে। গ্যাসীয় পদার্থকে বিশুদ্ধ করার পর তাকে কোল গ্যাস বলে। যা গ্যাসীয় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কোল গ্যাসে মিথেন আছে 25-33%, কার্বন মনোক্সাইড 5-10%, হাইড্রোজেন 45-55%, অ্যাসিটিলিন, ইথিলিন এবং বেনজিন একত্রে 2·5-5·5%, নাইট্রোজেন 2-10%,

কার্বন ডাই-অক্সাইড 5% এবং অক্সিজেন 2%। কোল গ্যাসের তাপমূল্য প্রায় 550 B.Th.U প্রতি ঘন ফুটে। পুরানো কোলকাতার রাস্তায় গ্যাসবাতি এই কোল-গ্যাস দিয়ে জ্বালানো হতো। আর এই কোলগ্যাস প্রস্তুত করত ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানি কয়লার কার্বনীকরণ করে। কোলকাতায় রাস্তায় গ্যাসবাতি না থাকলেও বিভিন্ন শিল্পে, রান্নার কাজে এবং স্কুল কলেজে বার্নার জ্বালাতে আজও ব্যবহৃত হচ্ছে কোলগ্যাস। বর্তমানে এই গ্যাস দুর্গাপুর থেকে পাইপ লাইন দিয়ে কোলকাতায় আনা হয়।

অ্যামোনিয়াক্যাল লিকার থেকে অ্যামোনিয়া এবং অ্যামোনিয়াম সার প্রস্তুত করা হয়। কোক কয়লা ধাতু শিল্পে বিজারক হিসেবে এবং বিভিন্ন শিল্পে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমরা বাড়ীতে রান্নার জন্য যে কয়লা ব্যবহার করি আসলে তা কোক কয়লা। খনি থেকে তোলা কয়লাকে কাঁচা কয়লা বা পাথুরে কয়লা বলে।

কোলটার থেকে প্লাস্টিক, রং, দ্রাবক, নাইলন, ওষুধ, তরল জ্বালানি, কীটনাশক পদার্থ, কসমেটিক, টারপোলিন এবং বহু প্রকার জৈব যৌগ প্রস্তুত করা হয়। এছাড়া কাঠ সংরক্ষণে এবং পীচের রাস্তা তৈরীতে প্রচুর পরিমাণে কোলটার প্রয়োজন হয়। এখনও অনেক জায়গায় শুধুমাত্র কোক প্রস্তুতের জন্য কার্বনী-করণ করা হয় এবং এক্ষেত্রে কোলটার ও কোলগ্যাসকে জ্বালিয়ে তাপ উৎপাদনে ব্যবহার করা হয় বা নষ্ট করা হয়।

কার্বনীকরণ দুভাবে করা যায়—(i) কম তাপমাত্রায় কার্বনীকরণ এবং (ii) বেশী তাপমাত্রায় কার্বনীকরণ। কম তাপমাত্রায় কার্বনীকরণে তরল পদার্থের পরিমাণ বেশী হয় এবং বেশী তাপমাত্রায় কার্বনীকরণে তরল পদার্থের পরিমাণ কম হয়। কার্বনীকরণে দু ধরনের পাত্র ব্যবহার করা হয়—(ক) উল্লম্ব পাত্র, (খ) অনুভূমিক পাত্র।

কয়লার গ্যাসীকরণ

বাতাস, অক্সিজেন, জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাই-অক্সাইড বা এদের মিশ্রণের সঙ্গে কয়লার বা কোক বা কাঠকয়লার বিক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্যাসীয় জ্বালানির উৎপাদনকে কয়লার গ্যাসীকরণ বলে। উৎপন্ন গ্যাসীয় জ্বালানিতে কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন, মিথেন ইত্যাদির সঙ্গে অন্যান্য পদার্থও বর্তমান থাকে। কয়লার গ্যাসীকরণের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ওপর এই সকল উপাদানের অনুপাত নির্ভর করে। বাতাস বা অক্সিজেন মাধ্যমে কয়লা বা কোক বা কাঠকয়লার বিক্রিয়ায় উৎপন্ন তাপ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বিক্রিয়াটিকে দহন বলে। একে গ্যাসীকরণ বিক্রিয়া বলে না।

সস্তায় প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়ার অনেক আগে থেকেই কয়লার গ্যাসীকরণ চালু ছিল। বর্তমানে অধিক বা কম তাপমূল্য বিশিষ্ট গ্যাস গ্যাসীকরণ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা যায়, যা কিনা প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিবর্তে বা পরিপূরক হিসেবে একইভাবে ব্যবহার করা যায়। কয়লা থেকে প্রাপ্ত গ্যাসকে তাপ উৎপাদনের জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রে, ধাতু ও অন্যান্য শিল্পে, গৃহস্থের জ্বালানি হিসেবে এবং আলো উৎপাদনে ও বিজারক হিসেবে ধাতু শিল্পে খুবই ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজনের জন্য হাইড্রোজেন ও কার্বন মনোক্সাইড উৎপাদনে কয়লার গ্যাসীকরণ করা হয়। কয়লার গ্যাসীকরণ দিয়ে প্রোডিউসার গ্যাস, ওয়াটার গ্যাস, সেমিওয়াটার গ্যাস, কার্বুরেটেড ওয়াটার গ্যাস ইত্যাদি প্রস্তুত করা যায়।

শ্বেততপ্ত (100°C) কোকের ওপর দিয়ে শুষ্ক বাতাস প্রবাহিত করলে বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে কোকের বিক্রিয়ায় কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই গ্যাসে কার্বন মনোক্সাইড ছাড়াও মিথেন, হাইড্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন বর্তমান থাকে। বিক্রিয়ায় তাপমাত্রা কমে গেলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। উৎপন্ন গ্যাসে অবস্থিত সালফার জাত যৌগদের জল দিয়ে ধুয়ে দূর করা হয়। আয়তন অনুসারে প্রোডিউসার গ্যাসে কার্বন মনোক্সাইড (CO)—20%, মিথেন 8%, হাইড্রোজেন (H_2)—6%, কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)—4% এবং নাইট্রোজেন (N_2)—62%। এই গ্যাসের তাপমূল্য 150 B.Th.U প্রতি ঘন ফুটে।

ওয়াটার গ্যাস

শ্বেত-তপ্ত (1000°C) কোকের সঙ্গে জলীয় বাষ্পের বিক্রিয়ায় সমায়তন কার্বন মনোক্সাইড এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। একে ওয়াটার গ্যাস বলে।

ওয়াটার গ্যাসে অল্প পরিমাণে মিথেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বর্তমান থাকে। বিক্রিয়াটি তাপশোষক বিক্রিয়া। তাই শ্বেত-তপ্ত কোকের মধ্য দিয়ে কিছুক্ষণ জলীয় বাষ্প পরিচালিত করলে চুল্লীর তাপমাত্রা কমে যায়। তাপমাত্রা কমে গেলে কার্বন মনোক্সাইডের পরিবর্তে কার্বন ডাই-অক্সাইডের উৎপাদন বাড়বে। তাই কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর জলীয় বাষ্পের পরিবর্তে চুল্লীর মধ্য দিয়ে বাতাস প্রবাহিত করে তাপমাত্রা বাড়িয়ে নেওয়া হয়। উৎপন্ন ওয়াটার গ্যাসকে ব্যবহারের পূর্বে সালফার যৌগ অপসারিত করা হয়। এই গ্যাসের তাপমূল্য 300 B.Th.U/ঘন ফুট।

প্রোডিউসার গ্যাস ও ওয়াটার গ্যাসের মিশ্রণকে সেমিওয়াটার গ্যাস বলে। এই গ্যাসের তাপমূল্য 180 B.Th.U/ঘন ফুট।

কার্বুরেটেড ওয়াটার গ্যাস

কেরোসিন বা কেরোসিনের ন্যায় তেলকে উত্তাপে ভঞ্জন করে গ্যাসীয় জ্বালানিতে পরিণত করার পর ওয়াটার গ্যাসের সঙ্গে মিশিয়ে নিলে তাকে কার্বুরেটেড ওয়াটার গ্যাস বলে। সালফার যৌগ অপসারণের পর বিশেষ অনুঘটকের সাহায্যে ওয়াটার গ্যাসে বর্তমান কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় মিথেনে পরিণত করা যায়। এই গ্যাসের তাপমূল্য খুবই বেশী, প্রায় 1000 B.Th. U/ঘন ফুট।

এখনও অনেক কয়লাখনি আছে যেখান থেকে কয়লা তোলা বিপজ্জনক বা অসম্ভব। সেইসব খনির অভ্যন্তরে কয়লাকে গ্যাসীভূত করে বার করে নেওয়া যায়, যা শক্তির চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে।

কয়লার তরলীকরণ

কয়লা থেকে বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অশোধিত পেট্রোলিয়ামের মত তরলে পরিণত করাকে কয়লার তরলীকরণ বলে। কয়লা থেকে প্রাপ্ত ঐ অশোধিত তরলকে পেট্রোলিয়ামের মত পরিশোধিত করে ব্যবহারের উপযোগী বিভিন্ন তরল জ্বালানি প্রস্তুত করা যায়। আর এর ফলে পেট্রোলিয়ামের সংকটের হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়। এই পদ্ধতির আর একটা বিশেষ সুবিধে হলো এই, যে তরল জ্বালানি কয়লা থেকে পাওয়া যায় তাতে ছাইয়ের ওজন পরিমাণ 0·1%-এর কম থাকে। আর সালফার থাকে 0·8%-এর বেশী নয়। ফলে অত্যন্ত সালফার যুক্ত কয়লাকে এই পদ্ধতিতে তরলে পরিণত করা যেতে পারে। প্রাপ্ত জ্বালানি থেকে বায়ুদূষণ মাত্রা খুবই কম হবে বিশেষ করে সালফার ডাই-অক্সাইড দূষণ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীতে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে কয়লার তরলীকরণ শুরু হয়। এ পদ্ধতিকে ফিসার ট্রপস (Fischer Tropsch) পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতিতে গুঁড়ো কয়লাকে তেলের সঙ্গে মিশিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাসের উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তরলকে আংশিক পাতনে বিভিন্ন স্ফুটনাঙ্কের তরল জ্বালানি পাওয়া যায়। যাদের পেট্রোলিয়াম থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন তরল জ্বালানির পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা চলে। কয়লার তরলীকরণ হাইড্রোজেন দ্বারা করা হয় বলে অনেক সময় এই পদ্ধতিকে কয়লার হাইড্রোজিনেশন-ও বলে। উত্তপ্ত কয়লার সঙ্গে জলীয় বাষ্পের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্যাস থেকে অন্যান্য পদার্থকে দূর করে প্রয়োজনীয় হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত করা হয়। কয়লার তরলীকরণে প্রাপ্ত তরলের একটি অংশ কয়লার গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে পুনরায় ব্যবহার করা হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীতে বছরে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টন তরল জ্বালানি এই পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হতো।

আজকাল বিভিন্ন পদ্ধতিতে কয়লার তরলীকরণ করা হয়ে থাকে। এগুলো মোটামুটি ফিশার ট্রপস পদ্ধতির মত, তবে তাপমাত্রা, হাইড্রোজেনের চাপ, তরলের পরিমাণ ইত্যাদি এবং অনুঘটক বিভিন্ন হয়।

গ্যাসীকরণ ও তরলীকরণের সুবিধে-অসুবিধে

কয়লা থেকে প্রাপ্ত গ্যাস বা তরল জ্বালানি ব্যবহারে পরিবেশ দূষণ কম হয়। কয়লা খনি থেকে কয়লা কেটে নেবার পর যে কয়লা আর কেটে তোলা সম্ভব নয়, সেই কয়লা গ্যাসীকরণে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া বিপজ্জনক ও তোলা অসম্ভব কয়লা খনির ভেতরে ঐ কয়লাকে গ্যাসে পরিণত করা যায়। কয়লা অপেক্ষা গ্যাস ও তরল সহজে তাপ উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়। গ্যাসীকরণে ও তরলীকরণে যে কোন শ্রেণীর নিকৃষ্টমানের কয়লাকে ব্যবহার করা যায়, বিশেষ করে সালফার যুক্ত কয়লা।

কয়লার গ্যাসীকরণে বা তরলীকরণে প্রচুর পরিমাণে জলের প্রয়োজন হয়। কয়লার গ্যাসীকরণ করতে প্রাথমিক খরচ খুবই বেশী। গ্যাসীকরণ ও তরলীকরণে কয়লার মোট শক্তির একটা বড় অংশ নষ্ট হয়। এই দুই উপায়ে উৎপন্ন জ্বালানির দাম অন্যভাবে উৎপাদিত জ্বালানির থেকে বেশী পড়ে।

পিট

ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে নবীনতর কয়লাকে পিট বলে। পিটও একটি জীবাশ্ম জ্বালানি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই পিটকে শক্তি উৎপাদন থেকে আরম্ভ করে নানা কাজে লাগানো হয়। গ্যাসীকরণে, সক্রিয় কার্বন প্রস্তুতিতে এবং জমির উর্বরা শক্তিকে বাড়াতে পিট ব্যবহার করা হয়।

পিট ভূপৃষ্ঠের খুব কাছে থাকে বলে একে আহরণ করা সহজ। পিটে সালফারের পরিমাণ খুব কম থাকে বলে এর দহনে সালফার ডাই-অক্সাইডের উৎপাদনও খুব কম হয়। ফলে বায়ুদূষণ কম হয়। গ্যাসীকরণের কাজে পিট সহজেই ব্যবহার করা যায়। পিটে সাধারণত প্রচুর পরিমাণে জল থাকে বলে পিটকে ব্যবহারের আগে শুকিয়ে নিতে হয়। পিটের আয়তন বেশী বলে পরিবহণ ব্যয় বেশী পড়ে।

সারা পৃথিবীতে প্রায় 340×10^9 টন পিট আছে এবং পৃথিবীতে প্রতি বছরেই এই পিট উৎপন্ন হচ্ছে। ফলে এটি পুনর্নবীভবনযোগ্য জ্বালানি।

কয়লার সুবিধে এবং অসুবিধে

প্রাপ্তির দিক থেকে জীবাশ্ম জ্বালানির মধ্যে কয়লার স্থান একনম্বরে। কয়লা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাওয়া যায়। কয়লাকে খনিমুখে বা অন্য কোথাও জমা করে রাখা এবং পরিবহণে কোন সমস্যা নেই। কয়লাকে সহজেই তাপ উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়। কয়লা থেকে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় জ্বালানি পাওয়া ছাড়াও অ্যামোনিয়া, কোলটার ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় পদার্থ পাওয়া যায়।

কয়লা যদিও প্রায় হাজার বছর ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে তবুও এর ব্যবহার নানা দিক থেকে অসুবিধেজনক। খনি থেকে কয়লা তোলার সময় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। মোটামুটি তিন ধরনের দুর্ঘটনা খনিতে ঘটে—(i) মিথেনে আগুন লেগে বিস্ফোরণ, (ii) খনির ছাদ ধ্বসে পড়া এবং (iii) খনি গর্ভে হঠাৎ জল ঢুকে পড়া। এই সব দুর্ঘটনা থেকে আমাদের দেশেও অনেক লোক মারা পড়ে। এ প্রসঙ্গ চাসনালার খনি দুর্ঘটনার কথা সবার জানা আছে। কয়লার সূক্ষ্ম গুঁড়ো শরীরের মধ্যে ঢুকে শ্বাসযন্ত্রের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে শরীরকে অসুস্থ করে তোলে এবং এর ফলে অনেক লোক মারা যায়।

বিশাল বিশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে, ধাতু শিল্পে বিশেষ করে লোহা নিষ্কাশনে এবং বিভিন্ন শিল্পে প্রতিদিন যে লক্ষ লক্ষ টন কয়লা পুড়ছে তার থেকে যে সকল পদার্থ সৃষ্টি হচ্ছে তা আমাদের পরিবেশকে নানাভাবে দূষিত করছে। পরিবেশ দূষিত করতে কয়লার জুড়ি মেলা কঠিন। কয়লার দহনে সবচেয়ে বেশী উৎপন্ন হয় কার্বন ডাই-অক্সাইড, এর পরের স্থানে আছে যথাক্রমে সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেনের অক্সাইড সমূহ, কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোকার্বন এবং অ্যালডিহাইড। এই সকল যৌগগুলি মানুষ ও জীবজন্তুর শরীরের পক্ষে মারাত্মক। এছাড়া কয়লা খননে এবং ব্যবহারে প্রচুর কয়লার গুঁড়ো এবং ধুলোবালি বাতাসে মেশে। এটিও জীবজগতের স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক। কয়লার দহনে পারদ ঘটিত যৌগ যা বার হয় তা জল ও বাতাসকে দারুণভাবে দূষিত করছে। আর ক্যানসার রোগ বিস্তারে যে সকল জৈব যৌগ বিশেষ সক্ষম অর্থাৎ কার্সেনোজেনিক যৌগ (Carcenogenic compound) কয়লার দহনের ফলে বাতাসে তা প্রচুর পরিমাণে মিশে যাচ্ছে। পারদ ঘটিত যৌগদ্বারা পরিবেশ দূষণে কয়লার জুড়ি নেই।

সালফার ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাতাসে বাড়লে তা বৃষ্টির সঙ্গে জমিতে এসে পেঁছায়। একে অ্যাসিড বৃষ্টি বলে, কারণ সালফার ডাই-অক্সাইড জলের সঙ্গে বিক্রিয়ায় অ্যাসিড উৎপন্ন করে। এই অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে জমিতে উপস্থিত খনিজ

পদার্থ দ্রবীভূত হয়ে জলের সঙ্গে চলে যায়। ফলে ভূমিক্ষয় তাড়াতাড়ি হয়। এই অ্যাসিড বৃষ্টি গাছের বৃদ্ধিতে নানারকম বাধা সৃষ্টি করে। ফলে গাছের সংখ্যা কমে যায়। এতে মরুভূমির আগ্রাসন বাড়তে থাকে। বাতাসে কার্বন ও সালফারের অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধিতে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়বে। ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে গেলে প্লাবনের সম্ভাবনা আছে। তাপমাত্রা বাড়লে বৃষ্টিপাতও কমবে। ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হবে।

কয়লার দহনে উদ্ভূত তাপের একটা বড় অংশ পরিবেশে মিশে গিয়ে পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করছে।

যে সব শিল্পে কয়লা ব্যবহার করা হয় সেইসব শিল্পে শীতলীকরণে প্রচুর জল প্রয়োজন হয়। এছাড়া কয়লাকে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতেও প্রচুর জল লাগে। এই সব ব্যবহৃত জলে নানা আবর্জনা ময়লা চলে এসে জল দূষিত করছে।

কয়লা ব্যবহারে উদ্ভূত ছাই আর একটা মারাত্মক সমস্যা। ছাইয়ের সূক্ষ্ম গুঁড়ো বাতাসে ভেসে বেড়ায় এবং এই ছাইয়ের কণা বাতাস দূষিত করছে। প্রতিদিন যে প্রচুর পরিমাণে ছাই উৎপন্ন হচ্ছে তা ফেলার জায়গার অভাব আছে। কারণ ছাই যেখানে ফেলা হবে সেখানকার কৃষিজমি নষ্ট হবে। কয়লা যে অঞ্চলে ব্যবহার করা হয় সেই এলাকা কালি ঝুলিতে ভরে যায়।

আজকাল শিল্পে ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর ব্যবহারে কয়লা থেকে উদ্ভূত ধুলোবালি ও ছাইয়ের কণা অধঃক্ষিপ্ত করে বাতাসে মিশতে দেওয়া হচ্ছে না। এছাড়া কয়লাকে ধুয়ে ছাই ও সালফারের পরিমাণ কমিয়ে ফেলা হচ্ছে। কয়লার দহনে উদ্ভূত সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে জলে ধুয়ে দ্রবীভূত করে বাতাসে মিশতে দেওয়া হচ্ছে না।

কয়লার দহনে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে এই গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি করছে। এতে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বৃষ্টিপাত কমবে। যার ফল আমাদের সবার জানা আছে। তবে জ্বালানির দহনে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইডের একটা বড় অংশ সমুদ্র জলে দ্রবীভূত হয়ে যায়। এটা জীবজগতের পক্ষে খুবই সুখের কথা।

প্রাকৃতিক গ্যাস

প্রাকৃতিক গ্যাসও একটি জীবাশ্ম জ্বালানি। খ্রীঃ পূঃ প্রায় এক হাজার বছর আগে চীন দেশের লোকেরা নলকূপের সাহায্যে প্রাকৃতিক গ্যাস বার করতে জানতো

এবং এই গ্যাসকে বাঁশের পাইপের সাহায্যে বহু দূর নিয়ে গিয়ে আলো আর উত্তাপের জন্য ব্যবহার করতো। এর বহুকাল পর পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে লবণাক্ত জলকে বাষ্পীভূত করতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার হতো। 1802 খ্রীষ্টাব্দে ইতালির জেনোয়া শহরে রাস্তার আলোর জন্য প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

প্রাকৃতিক গ্যাস হলো দাহ্য পদার্থ এবং ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে সছিদ্র পাথরের মধ্যে অবস্থান করে। প্রাকৃতিক গ্যাসকে কোথাও কোথাও মুক্ত অবস্থায় পাওয়া গেলেও পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে একত্রে পাওয়া যেতে পারে। মোট প্রাকৃতিক গ্যাসের 40% মাত্র পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক গ্যাস স্থলভাগ এবং সমুদ্রদরিয়াতেও পাওয়া যেতে পারে। পেট্রোলিয়াম যেমন ডোম (dome) আকারের অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের খাঁজে [যাকে ক্যাপ (cap) বলে] আটকে থাকে; তেমনি প্রাকৃতিক গ্যাসও এই রকম ক্যাপে আটকে থাকে। পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে থাকলে এই ক্যাপের ওপর দিকে থাকে প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম থাকে এর পরে এবং সবচেয়ে তলায় থাকে জল। অত্যধিক চাপে প্রাকৃতিক গ্যাস পেট্রোলিয়ামে দ্রবীভূত হয়ে বা মিশে থাকতে পারে। কয়লা খনিতেও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়। প্রতি টন কয়লায় 200 ঘন ফুট মিথেন পাওয়া যায়।

বায়ুর অবর্তমানে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জৈব যৌগের ওপর চাপের প্রভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের সৃষ্টি হয়। কম স্ফুটনাঙ্কের হাইড্রোকার্বন যৌগের মিশ্রণ হলো প্রাকৃতিক গ্যাস। এই গ্যাসে প্রায় 85% থাকে মিথেন (স্ফুটনাঙ্ক −159°C), ইথেন (স্ফুঃ −89°C) আছে 10%, প্রোপেন (স্ফুঃ −71·3°C) 3%। এছাড়া বিউটেন, পেন্টেন, হেক্সেন, হেপ্টেন, অক্টেনও থাকতে পারে। আর নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, কার্বন ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইডও থাকতে পারে। মিথেনের পরিমাণ বেশী থাকলে সেই প্রাকৃতিক গ্যাসকে শুষ্ক গ্যাস (dry gas) বলে। আর উচ্চতর আণবিক গুরুত্ব বিশিষ্ট হাইড্রোকার্বন বেশী থাকলে তাকে 'আর্দ্র গ্যাস' (wet gas) বলে। কারণ C_5 থেকে C_{10} বিশিষ্ট হাইড্রোকার্বনগুলি সাধারণ তাপমাত্রায় তরল পদার্থ। হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস বেশী থাকলে তাকে 'সাওয়ার গ্যাস' (sour gas) বলে। প্রাকৃতিক গ্যাসের নিজস্ব কোন গন্ধ নেই।

প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানি হিসেবেই প্রধানত ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের মধ্যে যে রাসায়নিক শক্তি নিহিত আছে দহনে তা মুক্তি পায়। প্রাকৃতিক গ্যাসের সাহায্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, হিমায়ন যন্ত্র চালানো হয় এবং জল ও ঘর গরম করতে সরাসরি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া নাইট্রোজেন ও ভুসাকালি প্রস্তুতিতেও

ব্যবহার করা যায়। এই হাইড্রোজেন সার ও হাইড্রোজিনেশান শিল্পে ব্যবহার করা চলে। যে প্রাকৃতিক গ্যাসে হিলিয়াম পাওয়া যায় সেই গ্যাস থেকে হিলিয়াম উদ্ধার করা হয়। মিথানলও প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে প্রস্তুত করা যায়।

পেট্রোলিয়ামের খনি যেমন স্থলভাগে আছে আবার সমুদ্রদরিয়ায়ও আছে, তেমনি প্রাকৃতিক গ্যাসের খনি বা ক্ষেত্রে উভয় অঞ্চলে আছে। এমনকি চিরতুষার রাজ্যেও আছে। যেমন মাত্র 200 ফুট ড্রিল করে এই গ্যাসের সন্ধান মিলেছে, তেমনি আবার সমুদ্রদরিয়ায় 10000 ফুটও ড্রিল করতে হয়েছে।

প্রাকৃতিক গ্যাসের খনি থেকে ড্রিল করে পাইপের সাহায্যে এই গ্যাস তোলা হয় এবং পাইপলাইনের সাহায্যে উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে ব্যবহার করার অঞ্চলে পাঠানো হয়। সাধারণত এই পাইপ লাইনের সাহায্যে এই গ্যাস পরিবহণ করা হয়। এইভাবে পরিবহণে প্রাথমিক ব্যয় প্রচুর হলেও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ কম। এই গ্যাসের চাহিদা দিনের সব সময় এবং বছরের সব সময় একরকম থাকে না। তাই উৎপাদনের পর এই গ্যাসকে কোন জায়গায় জমা করে রাখা হয় এবং পরে প্রয়োজনানুসারে সরবরাহ করা হয়। গ্যাসকে সঞ্চয় করে রাখতে গ্যাস আধারের আয়তন খুবই বিশাল হওয়া দরকার। কিন্তু এই গ্যাসকে তরলে পরিণত করলে আয়তন খুবই কম হয়। যেমন 600 ঘন ফুট প্রাকৃতিক গ্যাসকে তরলে পরিণত করলে আয়তন মাত্র এক ঘন ফুট হয়। তাই সাধারণত তরল প্রাকৃতিক গ্যাসকে (Liquid natural gas LNG) বিশেষ ধরনের আধারে সঞ্চিত করে রাখা হয় বা বিশেষ ধরনের ট্যাংকার ও জাহাজে পরিবহণ করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস বাতাসের সঙ্গে মিশে অত্যন্ত বিস্ফোরক পদার্থ সৃষ্টি করে। তাই এই গ্যাসকে পরিবহণে এবং সঞ্চয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। পাইপ লাইন বা জাহাজ দিয়ে যেখানে এই গ্যাসকে পরিবহণ করা হয় না বা যায় না, সেখানে, সাধারণত এই গ্যাসকে পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলা হয়।

জীবাশ্ম জ্বালানির মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস দহনে কালিঝুলি সবচেয়ে কম হয়। এই গ্যাসকে সহজে সঞ্চিত করে রাখা যায়, পরিবহণ করা সহজ এবং নিয়ন্ত্রিত ভাবে দহন করা যায়। এই গ্যাসে সালফারের যৌগ কম থাকায় দহনে পরিবেশ দূষণ অপেক্ষাকৃত কম হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান অসুবিধা হলো যে, এর ভাণ্ডার পৃথিবীতে সীমিত। ফলে আয়ুও সীমিত। পরিবহণে প্রাথমিক ব্যয় প্রচুর। প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে বিস্ফোরণের ভয় সব সময় থাকে। এই গ্যাস দহনে জল ও বাতাস দূষিত হয়।

প্রাকৃতিক গ্যাসকে মাটির নিচে গহ্বরে বা পরিত্যক্ত খনি গহ্বরে সঞ্চিত করে রাখা যায় এবং পরে প্রয়োজন মত মাটির তলা থেকে তুলে ব্যবহার করা যায়।

1915 খ্রীষ্টাব্দে কানাডায় অনটারিও অঞ্চলে গ্যাসকে প্রথম মাটির নিচে সঞ্চয় করে রাখা হয়।

পেট্রোলিয়াম

কয়লার মত পেট্রোলিয়ামও একটি জীবাশ্ম জ্বালানি। বর্তমান সভ্য জগতের উন্নতি ও সাফল্য মাপতে আমরা পেট্রোলিয়াম ব্যবহারের পরিমাণের ওপর গুরুত্ব দিই। পেট্রোলিয়ামের অভাবে যে কোন দেশের অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে যাবে। যে দেশে এই বস্তুটির অভাব আছে তাদের বিদেশ থেকে পেট্রোলিয়াম বা পেট্রোলিয়াম পদার্থ আমদানি করতেই হয়। ফলে বৈদেশিক মুদ্রায় টান পড়ে। পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারক দেশগুলি সুযোগ বুঝে এর দাম আকাশ ছোঁয়া করে নিজেদের ধনকুবেরে পরিণত করছে, আর অন্যরা হচ্ছে ভিখারী। আর এর জন্যই পেট্রোলিয়ামকে তরল সোনা বলে।

ভূপৃষ্ঠের গভীরে বিশেষ প্রাকৃতিক অবস্থায় যে দাহ্য তরল পদার্থ মেলে তাকে বলে পেট্রোলিয়াম। পেট্রোলিয়ামের ঝরণা এবং পুকুর পৃথিবীর কোথাও কোথাও চোখে পড়ে। ড্রিল করে স্টিল পাইপ বসিয়ে ভূপৃষ্ঠের তলা থেকে পেট্রোলিয়াম তোলা হয়। খনি থেকে তোলা এই দাহ্য তরলকে পেট্রোলিয়াম (petrolum) বা খনিজ তেল (mineral oil) বা অশোধিত তেল (crude oil) বলে। পেট্রোল এবং পেট্রোলিয়াম এক বস্তু নয়। পেট্রোলিয়ামের পাতনে প্রাপ্ত বিশেষ হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ যার স্ফুটনাংক 30°—200°C-এর মধ্যে থাকে তাকে বলে পেট্রোল বা গ্যাসোলিন। এটি বিমান এবং মোটরের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পেট্রোলিয়াম শব্দটা ল্যাটিন কথা petra মানে পাথর এবং oleum মানে তেল থেকে এসেছে। রাসায়নিকভাবে পেট্রোলিয়াম হলো হাইড্রোকার্বন যৌগের জটিল মিশ্রণ। (কার্বন হাইড্রোজেন দিয়ে গঠিত যৌগদের হাইড্রোকার্বন বলে)। অশোধিত তেলে মৌল সালফার ও সালফার যৌগ, অক্সিজেন যৌগ এবং নাইট্রোজেন যৌগ বর্তমান থাকে। সালফার যৌগের মধ্যে আছে হাইড্রোজেন সালফাইড, মারকেপ-টান বা থায়োল এবং জৈব সালফাইড। ফিনল ও কার্বক্সাইলিক অ্যাসিড হিসেবে অক্সিজেন যৌগ এবং পিরিডিন ও কুইনোলিন হিসেবে নাইট্রোজেন যৌগ বর্তমান। এছাড়া অনেক ধাতব এবং অধাতব যৌগ অশোধিত তেলে থাকে। তবে তাদের পরিমাণ খুবই নগণ্য। অশোধিত তেল জলের চেয়ে হাল্কা (আপেক্ষিক গুরুত্ব 0·78—0·97) এবং জলে অদ্রাব্য। কিন্তু ইথার, বেনজিন ইত্যাদি জৈব দ্রাবকে দ্রাব্য। অশোধিত তেলের রং সাধারণত কালো হলেও ধূসর থেকে লাল

এবং বর্ণহীন পর্যন্ত হতে পারে এবং কখন কখন সবুজ রংয়ের প্রতিপ্রভ (fluorescence) দেখা যায়। এই অশোধিত তেল তরল থেকে আরম্ভ করে অতি সান্দ্র তরল এমনকি কঠিনও হতে পারে। অশোধিত তেলে 50% থেকে 98% পর্যন্ত হাইড্রোকার্বন থাকতে পারে এবং অবশিষ্ট অংশে থাকে সালফার, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগ।

পেট্রোলিয়ামে তিন ধরনের হাইড্রোকার্বন থাকতে পারে: (i) প্যারাফিন বা অ্যালকেন, (ii) সাইক্লো-অ্যালকেন, (iii) অ্যারোম্যাটিক।

(i) প্যারাফিন বা অ্যালকেন (C_nH_{2n+2})

অশোধিত তেলে মিথেন (CH_4), ইথেন (C_2H_6), প্রোপেন (C_3H_8), বিউটেন (C_4H_{10}) ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে এমনকি ষাটটা কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন থাকতে পারে। সরলশৃংখল বিশিষ্ট অ্যালকেন বেশী থাকলেও শাখায়িত অ্যালকেনও অশোধিত তেলে থাকে।

(ii) সাইক্লো-অ্যালকেন

সাইক্লো অ্যালকেনের মধ্যে আছে সাইক্লোপেন্টেন, অ্যালকাইল সাইক্লোপেন্টেন, সাইক্লো-হেক্সেন ইত্যাদি। এ ছাড়া অন্যান্য ধরনের চক্রাকার হাইড্রোকার্বনও থাকে।

(iii) অ্যারোম্যাটিক যৌগ

টলুইন, জাইলিন, প্যারাসাইমেন, অ্যালকাইল ন্যাপথ্যালিন এবং অন্যান্য আরোম্যাটিক যৌগও অশোধিত তেলে থাকে। তবে অ্যারোম্যাটিক যৌগের পরিমাণ এই তেলে কম থাকে।

বিশেষ ভূতাত্ত্বিক অবস্থায় পেট্রোলিয়াম পাওয়া সম্ভব। নানা রকম ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার পর যে অঞ্চলে এটি পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল সেখানে ড্রিল করা হয়। এই ড্রিল স্থলভাগ ও জলভাগ অর্থাৎ সমুদ্রদরিয়ায় করা হয়। প্রচুর সম্ভাবনাময় অঞ্চলে ড্রিল করে পেট্রোলিয়াম বা প্রাকৃতিক গ্যাসের হদিশ নাও মিলতে পারে। ড্রিল করে যদি বোঝা যায় পেট্রোলিয়াম বা প্রাকৃতিক গ্যাস আছে এবং তা বাণিজ্যিক দিক থেকে লাভজনক হবে তবেই পেট্রোলিয়াম বা গ্যাসকে তোলার ব্যবস্থা করা হয়। পেট্রোলিয়াম কূপের গভীরতা 20,000 ফুট খুবই সাধারণ ব্যাপার। কূপের গভীরতা যত বাড়বে ড্রিল করা তত কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়সাধ্য। যদিও আজকাল অনেক উন্নত ধরনের ড্রিল করার ব্যবস্থা হয়েছে। সমুদ্রদরিয়ায় তেল তোলার জন্য বিশেষ ধরনের জাহাজ বা প্ল্যাটফরম ব্যবহার করা হয়। উৎপন্ন

তেলকে সমুদ্র বক্ষে পাতা পাইপ লাইনের সাহায্যে বা ট্যাংকারের সাহায্যে উপকূলে তেল পরিশোধন কারখানায় পাঠান হয়। স্থলভাগে উৎপন্ন অশোধিত তেলকেও পাইপ লাইনের সাহায্যে পরিশোধন কারখানায় পাঠান হয়। তেল উৎপাদন অঞ্চলে যদি পরিশোধনের অসুবিধে থাকে তবে পাইপ লাইনের সাহায্যে বহুদূরে অবস্থিত কারখানায় বা পোতাশ্রয়ে পাঠান হয়। পোতাশ্রয় থেকে জাহাজে করে বিভিন্ন দেশে অশোধিত তেল রপ্তানি করা হয়।



স্থলভাগে প্রাকৃতিক গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামের খনি

1860 খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম 177 কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপ লাইনের সাহায্যে পেট্রোলিয়াম পরিবহণ করা হয়। এখন পৃথিবীতে পেট্রোলিয়াম

পরিবহণের জন্য কয়েক লক্ষ কিলোমিটার পাইপ লাইনে আছে। আমাদের দেশেও পেট্রোলিয়াম পরিবহণের জন্য পাইপ লাইন ব্যবহার করা হয়। যেমন আমাদের পেট্রোলিয়াম খনি অঞ্চল থেকে এই পাইপ লাইনের সাহায্যে অশোধিত তেল নাহারকাটিয়া, বঙ্গাইগাঁও, বারৌনি শোধনাগারে পাঠান হয় এবং হলদিয়া বন্দর থেকে বারৌনি পর্যন্ত পাইপ লাইনের সাহায্যে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত অশোধিত তেল হলদিয়া বন্দর থেকে পাঠান হয়। এ ছাড়া বম্বে হাই অঞ্চলের সমুদ্রদরিয়ার তেলও পাইপ লাইনের সাহায্যে নানা জায়গায় পাঠান হয়।

প্রাকৃতিক গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি

যদিও এদের উৎপত্তির সঠিক কারণ জানা নেই, তবে দুধরনের মতবাদ এ বিষয়ে আছে।

(i) ধাতব কার্বাইডের ওপর জলের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হাইড্রোকার্বনের থেকে পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি। কিন্তু নানা কারণে এই তত্ত্বের অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়।

(ii) জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ অধিকচাপে জীবাণু দ্বারা বিয়োজনের ফলে পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে প্রচুর পরিমাণে এই সকল সামুদ্রিক প্রাণী যেমন অ্যালগি, প্যাংকটন, মাছ, ঝিনুক ইত্যাদি সমুদ্র তলায় জমা হয় এবং বালি, মাটি এদের ওপর জমা পড়ে। ফলে এদের মৃতদেহের সঙ্গে বাতাসের সংযোগ থাকে না। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বাতাসের অবর্তমানে জীবাণুগুলি এদের দেহের অন্যান্য অংশ নিঃশেষিত করলেও চর্বি ও তেল জাতীয় পদার্থের কিছুই হয় না। এই চর্বি ও তেলজাতীয় পদার্থই কালক্রমে পেট্রোলিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে বালি ও নোনা জলের সঙ্গে মাটির অনেক নিচে ডোম আকৃতির পাহাড়ের খাঁজে আটকে থাকে। নানা কারণে এই তত্ত্বের সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। চর্বি ও তেলের পেট্রোলিয়ামে রূপান্তর হতে কম পক্ষে চল্লিশ লক্ষ বছর লাগে।

পেট্রোলিয়ামের খনি খনন

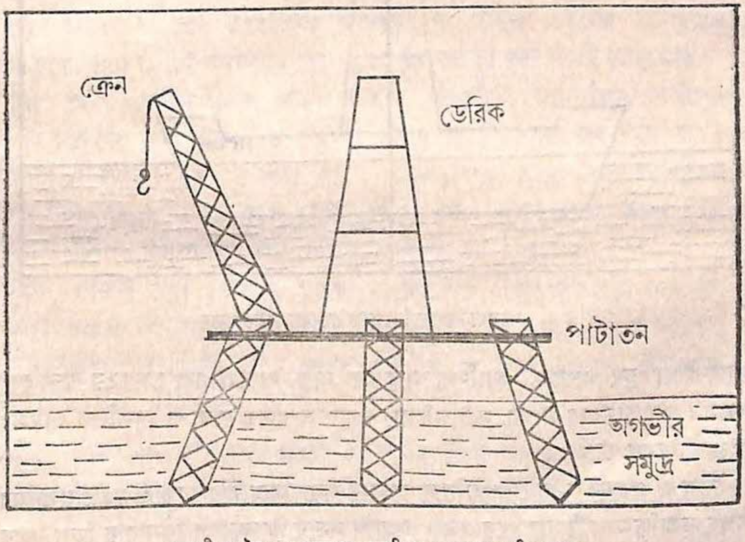
ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা এবং নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যেখানে পেট্রোলিয়াম পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী সেখানে তৈলকূপ খনন করা হয়। যে লোহার কাঠামোর সাহায্যে কূপ খনন করা হয় তাকে ডেরিক (derrick) বলে। এই ডেরিকের থেকে নানারকম খননযন্ত্রের সাহায্যে স্টিল পাইপ বসানো হয়। অনেকটা গভীর নলকূপ বসানোর মত। তবে এখানে ব্যাপারটা অনেক অনেক ব্যাপক। ড্রিল করতে বিশেষ ধরনের তরল পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এই সকল তরল

পদার্থের মধ্যে আছে জল, বিশেষধরনের কাদা এবং প্রাকৃতিক গ্যাস। এই তরল ভূস্তরের মাটি ও পাথর কাটতে সাহায্য করে এবং কাটা মাটি ও পাথরের টুকরোকে ওপরে তুলে নিয়ে আসে। এই সকল মাটি ও পাথরের টুকরোর নমুনা পরীক্ষা করে জানতে পারা যায় কি রকম গভীরতায় কি ধরনের স্তর আছে।

পাইপ একবার ড্রিল করতে আরম্ভ করলে যতক্ষণ না তেলের স্তরে পেঁাচচ্ছে ততক্ষণ অবিশ্রান্তভাবে ক্রমাগত বসিয়ে যাওয়া হয়। তেলের স্তরে পাইপ পেঁাছে গেলে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রবল চাপে পেট্রোলিয়াম পাইপ দিয়ে প্রবল বেগে পৃথিবীর ওপরে চলে আসে। একে স্বাভাবিক প্রবাহ (natural flow) বলে। গ্যাসের চাপ কমে গেলে বা গ্যাসের চাপ কম থাকলে তেল ওঠার হার কম হয়, তখন তৈলকূপে বাতাস ঢুকিয়ে কৃত্রিম উপায়ে চাপ বাড়িয়ে তেল ওপরে তোলা হয়। এছাড়া বিশেষ ধরনের পাম্পের সাহায্যেও তেল তোলা হয়। আর swabbing নামে এক বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যেও তেল তোলা হয়। খনি থেকে পাওয়া এই পেট্রোলিয়ামকে অশোধিত তেল (crude) বলে।

সমুদ্রদরিয়া থেকে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস

প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পেট্রোলিয়ামের খনি যেমন স্থলভাগে পাওয়া যায়

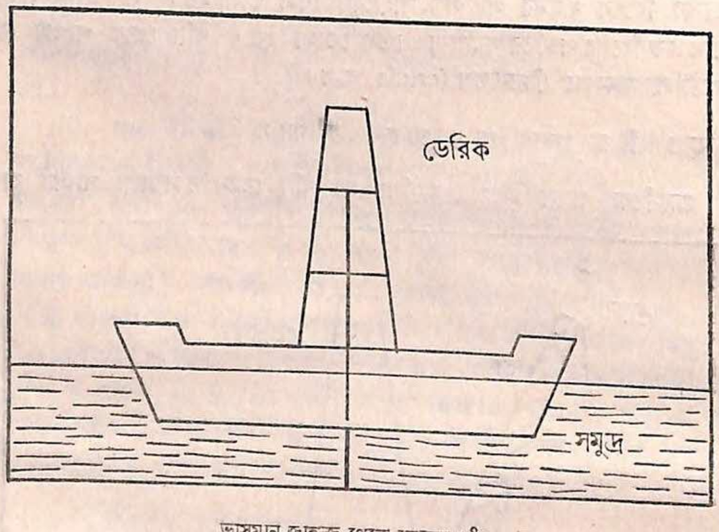


স্থায়ী পাটাতন থেকে সমুদ্রদরিয়ায় তেলের খনি খনন

তেমনই সমুদ্রদরিয়াতেও পাওয়া যেতে পারে। 1938 খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সমুদ্রদরিয়ায় তৈলকূপ খনন করা হয়।

আজকাল বহুদেশ এই সামুদ্রিক ঢাল ও মহীসোপান (সেখানে সমুদ্রের গভীরতা 1000 ফুটের মধ্যে) থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় অশোধিত তেলের খনি খনন করে তেল নিষ্কাশন করছে। ভারতও এই ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। ভারতের বোম্বে হাই সমুদ্রদরিয়া থেকে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস তোলা হচ্ছে। পৃথিবীর স্থলভাগে যে পরিমাণ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যাবে বলে মনে করা হয় তার 18% তেল এবং 9·5% গ্যাস পাওয়া যেতে পারে এই সমুদ্রদরিয়া থেকে।

পারস্য উপসাগরে পৃথিবীর বৃহত্তম তেলের ভাণ্ডারটি আছে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য ভাণ্ডার আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গাল্ফ কোস্টে, ভেনেজুয়েলার



ভাসমান জাহাজ থেকে তেলের খীন খনন

মারাকাইবো হ্রদ অঞ্চলে, ক্যাস্পিয়ান হ্রদের বাকু অঞ্চলে এবং ভারতের বম্বে হাই অঞ্চলে। এছাড়া উত্তর সাগর, নাইজিরিয়া, ওমান অঞ্চলেও তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডারটি বেশ ভালো।

তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের অস্তিত্ব জানার জন্য সামুদ্রিক ঢাল ও মহীসোপানের বিশেষ ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষার প্রয়োজন। আগে সমুদ্র উপকূলের কিনারায় ড্রিল করে প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল তোলা হতো। কালক্রমে অগভীর সমুদ্রের তলদেশ থেকে

নির্মিত বিশেষ ধরনের কাঠামোর ওপর স্থায়ী পাটাতনের থেকে ড্রিল করে পাইপ বসিয়ে তেল তোলা হয়। সমুদ্রের গভীরতা বাড়লে বিশেষ ধরনের ভাসমান পাটাতন এবং জাহাজ থেকে ড্রিল করে পাইপ বসিয়ে তেল তোলা হয়। সমুদ্র দরিয়ায় তৈলকূপের উৎপাদন যতদিন বজায় থাকবে ততদিন ঐ সকল কাঠামো (রিগ) পাটাতন এবং জাহাজ একই জায়গায় অবস্থান করবে। এইটাই একটা বিশেষ অসুবিধে। উৎপন্ন তেল পাইপ লাইনের সাহায্যে বা বিশেষ ধরনের তেলবাহী জাহাজ দিয়ে সমুদ্রোপকূলে নিয়ে আসা হয়। এই রিগ, ভাসমান পাটাতন, জাহাজ, পাইপলাইন ইত্যাদির জন্য সমুদ্রদরিয়া থেকে তেল তোলা বেশ খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার। এছাড়া স্থলভাগ থেকে দ্রুত যোগাযোগের জন্য যেমন হেলিকপ্টারের প্রয়োজন তেমন গভীর সমুদ্রে ডিল্ল করার জন্য চাই ডুবুরী ও তার সাজসরঞ্জাম আর সাবমেরিন। ফলে সমুদ্রদরিয়া থেকে তেল তুলতে গেলে চাই বিশেষ কয়েক ধরনের জিনিসের উৎপাদন।

স্থলভাগ ও সমুদ্রদরিয়া থেকে তৈল উৎপাদনের সমস্যা

তেল উৎপাদনের নানান সমস্যা আছে। যথা (i) অবক্ষয়, (ii) পাইপে প্যারাফিন জমে যাওয়া, (iii) ইমালশান, (iv) লবণ জল ইত্যাদি।

(i) অবক্ষয়ঃ তেল উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও পাইপ লাইনের নানাভাবে অবক্ষয় হতে পারে। এই অবক্ষয়ের দরুন তেল উৎপাদনের খরচ খুবই বেড়ে যায়।

(ii) তেল উৎপাদন অঞ্চলে পাইপ লাইনে প্যারাফিন জমে গিয়ে পাইপের মুখ বন্ধ করে দেয় ফলে অশোধিত তেলের প্রবাহ ও উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। নানাভাবে এই সমস্যা সমাধান করা যায়। যেমন, মাঝে মাঝে জমা প্যারাফিন পাইপের ভেতর থেকে চেঁচে তুলে ফেলা হয়। আর অনেক সময় উত্তপ্ত তেল প্রবাহিত করিয়ে প্যারাফিনকে গলিয়ে সরিয়ে ফেলা হয়।

(iii) বেশীর ভাগ তৈলকূপ থেকে তেলের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে লবণ জল ওঠে এবং তেল ও লবণ জলের মিশ্রণ প্রবল বেগে তোলার ফলে ইমালশানে পরিণত হয়। নানারকম ইমালশান বারক পদার্থ মিশিয়ে বা তাপ প্রয়োগে ইমালশান থেকে তেল আলাদা করা যায়।

(iv) তেল উৎপাদনের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে লবণ জলও খনি থেকে উঠে আসে। এই লবণ জল ফেলার জায়গার (বিশেষ করে স্থলভাগে) অভাব আছে। এতে পরিবেশ দূষিত হবে এবং বিশেষ করে জল ও জমি। তাই এই লবণ জলকে পুনরায় খনিগর্ভে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। এতে একদিকে যেমন পরিবেশকে

দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা হয় এবং অপরদিকে খনির মধ্যে চাপ বাড়ার ফলে তেল উৎপাদনের হার বজায় থাকে।

তৈলকূপ থেকে উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাসকে ঠিক মত কাজে লাগাতে না পারলে, আগে পুড়িয়ে দেওয়া হতো বা বাতাসে ছেড়ে দেওয়া হতো। দু' উপায়েই বায়ু দূষণ হবে। বর্তমানে এই দুই ব্যাপার নিয়ম বিরুদ্ধ। তাই বর্তমানে এই অব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাসকে পুনরায় খনিগর্ভে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। এতে একদিকে যেমন বায়ুদূষণ রোধ করা যায়, অপরদিকে প্রাকৃতিক গ্যাসের সংরক্ষণ সম্ভব। এছাড়া এতে তেল উৎপাদনের স্বাভাবিক হার বজায় থাকে।

সমুদ্রদরিয়া থেকে তেল উৎপাদনে একদিকে যেমন লোনাজলের প্রভাবে যন্ত্রপাতির ও পাইপ লাইনের দারুণ অবক্ষয় হয়, অপরদিকে সামুদ্রিক ঝড়ের দরুন ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা খুবই বেশী।

খনি থেকে পাওয়া এই অশোধিত তেলে প্রচুর জল অবদ্রব (ইমালশান) হিসেবে থাকে। এই তেলকে পাইপ লাইনের সাহায্যে দূরবর্তী কোন তৈল শোধনাগারে (oil refineries) নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে অশোধিত তেলকে (যা জলের সঙ্গে অবদ্রব হিসেবে বর্তমান) গরম করলে অবদ্রব থেকে তেল জলের ওপর ভেসে ওঠে। এই জলমুক্ত তেলকে পাম্প করে তুলে নিয়ে আংশিক পাতন করে বিভিন্ন তাপাংকে বিভিন্ন পদার্থ পাওয়া যায়, যাদের বিভিন্ন কাজে প্রয়োজন হয়।

আংশিক পাতন করতে জলমুক্ত অশোধিত তেলকে প্রথমে টিউব স্টীলে (tube still) 400°C-এ গরম করে শেল্ভস ও ভালব (shelves & valves) যুক্ত লম্ব স্তম্ভের তলায় ঢেলে দেওয়া হয়। 400°C-এ অশোধিত তেলের বিভিন্ন উৎপাদনের বাষ্প স্তম্ভের ওপর দিকে ওঠার সময় ঠাণ্ডা হতে লাগবে এবং অধিক স্ফুটনাঙ্কের তরল প্রথম ঘনীভূত এবং ক্রমান্বয়ে অন্যান্য অপেক্ষাকৃত কম স্ফুটনাঙ্কের তরল ঘনীভূত হবে। ফলে বিভিন্ন শেল্ভস থেকে বিভিন্ন তরল পাওয়া যাবে। আর 400°C-এ যে পদার্থ বাষ্পীভূত হয় না তা স্তম্ভের তলদেশ থেকে অবশেষ (residue) পদার্থ রূপে বার হয়ে যায়।

পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতনে প্রাপ্ত বিভিন্ন অংশকে নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে পরিশোধনের (refining) প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে বিভিন্ন অংশে সালফার যৌগ থাকলে তা অবশ্যই দূর করতে হবে। পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতনে প্রাপ্ত গ্যাসোলিন বা পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল তেল, পিচ্ছিলকারক তেল ইত্যাদি বিশেষভাবে পরিশোধন করা হয় এবং বিশেষ বিশেষ পদার্থ মিশিয়ে পেট্রোলের গুণাগুণ বাড়ানো হয়।

পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতনে প্রাপ্ত পদার্থসমূহ

নাম	স্ফুটনাঙ্ক °C	কার্বনের সংখ্যা	ব্যবহার
1. সাইমোজেন ও রিগোলিন	30 পর্যন্ত	4—5	হিমায়নকারী ও অচৈতন্যকারী পদার্থ ও জ্বালানি।
2. গ্যাসোলিন (straight run gasoline) বা পেট্রোল	30—200	5—11	বিমান ও মোটর গাড়ীর জন্য ব্যবহৃত তরল জ্বালানি।
(i) পেট্রোলিয়াম ইথার	30—70	5—6	দ্রাবকরূপে।
(ii) বেনজাইন	70—90	6—7	দ্রাবকরূপে এবং গরম পোশাক ধোয়ার কাজে।
(iii) লিগ্রোইন	80—120	6—8	দ্রাবক।
3. কেরোসিন	200—300	12—16	আলোর জন্য, স্টোভের তরল জ্বালানি এবং জেট ইঞ্জিনের জ্বালানি হিসেবে।
4. গ্যাস তেল বা ডিজেল তেল	300—400	13—18	ডিজেল ইঞ্জিনের জ্বালানি হিসেবে।
5. অবশেষ তরল	400 ওপর	16—30	
এর থেকে অনুপ্রেষ পাতনে পাওয়া যায়			
(i) পিচ্ছিলকারক তেল (lubricating oil)	,,	16—20	পিচ্ছিলকারক পদার্থ হিসেবে।
(ii) ভেজলিন	,,	16—22	মলম ও প্রসাধন প্রস্তুতিতে।
(iii) প্যারাফিন মোম	,,	20—30	মোমবাতি প্রস্তুতিতে ও কাগজের ওপর লাগাতে।
6. অবশেষ (বিটুমিন বা পিচ)	,,	30—40	রাস্তার কাজে ও রঞ্জন পদার্থ প্রস্তুতিতে।

অন্তর্দহন (internal combustion) পেট্রোল ইঞ্জিনের সিলিন্ডারে যেখানে পেট্রোলের দহন হয় সেই সিলিন্ডারে সংনমন অনুপাতের (compression ratio) মান যত বাড়বে ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা (efficiency) তত বাড়বে। পেট্রোল ইঞ্জিনের সংনমন অনুপাতের মান যখন সর্বোচ্চ হয় তখন সিলিন্ডারে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে পেট্রোলের দহন করান হয়। এই দহন কালে পেট্রোলের সমস্ত অংশ সমানভাবে অর্থাৎ সুষমভাবে না জ্বলে শেষের দিকে বিস্ফোরণ সহকারে জ্বলে এবং ফলে ইঞ্জিনে ধাতব আওয়াজের সৃষ্টি হয়। যাকে 'নকিং' (knocking) বলে। সে পেট্রোলের নকিং ধর্ম যত বেশী সেই পেট্রোলের কার্যদক্ষতা তত কম। অর্থাৎ সেই পেট্রোলের মান তত নিচু। নকিং যে কেন হয় তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও এটা দেখা গেছে যে, শাখাযুক্ত (branched chain) প্যারাফিন হাইড্রোকার্বনের থেকে সরল শৃংখল (straight chain) প্যারাফিন হাইড্রোকার্বন পেট্রোলে বেশী থাকলে সেই পেট্রোলের নকিংয়ের প্রবণতা অনেক গুণ বেড়ে যায়। নরম্যাল হেপ্টেনের ($CH_3 . CH_2 . CH_2 . CH_2 . CH_2 . CH_2 . CH_3$) নকিং ধর্ম সবচেয়ে বেশী এবং 2 : 2 : 4 ট্রাই মিথাইল পেন্টেনের

$$CH_3 . \overset{\displaystyle CH_3}{\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}} . CH_2 . \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} CH_3$$

[যাকে আইসো অক্টেন (Isooctane) বলে] নকিং ধর্ম সবচেয়ে কম। অর্থাৎ নরম্যাল হেপ্টেনের আঘাতবারক (antiknocking) ধর্ম সবচেয়ে কম এবং আইসো অক্টেনের সবচেয়ে বেশী। নরম্যাল হেপ্টেনের আঘাতবারকের মান শূন্য এবং আইসো অক্টেনের 100 ধরা হয় এবং কোন তরল জ্বালানির নকিং ধর্ম আইসো অক্টেন ও নরম্যাল হেপ্টেনের যে মিশ্রণের সঙ্গে মিলে যাবে, মিশ্রণের আইসো অক্টেনের শতকরা পরিমাণটি হবে ঐ তরল জ্বালানির অক্টেন সংখ্যা (octane number)। যে তরল জ্বালানির অক্টেন সংখ্যা যত বাড়বে সে জ্বালানিটি তত উপযোগী হবে।

যদি কোন তরল জ্বালানির নকিং ধর্ম 40% আইসো অক্টেন এবং 60% নরম্যাল হেপ্টেন মিশ্রণের সঙ্গে মিলে যায় তবে ঐ জ্বালানির অক্টেন সংখ্যা হবে 40।

পেট্রোলে ইথিলিন এবং অ্যারোম্যাটিক যৌগ থাকলে সেই পেট্রোলের অক্টেন নম্বর বেশী হয়। আবার টেট্রাইথাইল লেড [$(C_2H_5)_4Pb$] নামে যৌগটি পেট্রোলের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে এটি পেট্রোলকে সুষমভাবে দহনে সাহায্য করে। এতে পেট্রোলের অক্টেন সংখ্যা বেড়ে যায়। ফলে এটি পেট্রোলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। টেট্রাইথাইল লেড মেশানো পেট্রোলের দহনে সিলিন্ডারে লেড জমা পড়ে।

কিন্তু ইথিলিন ডাইব্রোমাইড ($BrCH_2.CH_2.Br$) নামে জৈব যৌগ ঐ পেট্রোলের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে দহনের সময় সিলিণ্ডারে লেড জমা না পড়ে উদ্বায়ী লেড ব্রোমাইডে পরিণত হয়ে ইঞ্জিনের সিলিণ্ডার থেকে নির্গমন পাইপ (exhaust pipe) দিয়ে বেরিয়ে যায়।

এতে ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বাতাসে লেডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে পরিবেশ দূষিত হতে থাকে। তাই আজকাল টেট্রাইথাইল লেডের পরিবর্তে পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতনে প্রাপ্ত বিভিন্ন সরল শৃংখল প্যারাফিনকে বিভিন্ন উপায়ে শাখাযুক্ত প্যারাফিন এবং অ্যারোম্যাটিক যৌগে পরিবর্তন করে পেট্রোলের অক্টেন সংখ্যা বাড়ানো হয়।

গ্যাসোলিন পরিশোধন

পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতনে প্রাপ্ত গ্যাসোলিনকে বা ভঞ্জনের (cracking) দ্বারা প্রাপ্ত গ্যাসোলিনকে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে ধুয়ে সালফার যৌগ এবং অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন দূর করা হয়। গ্যাসোলিনকে কস্টিক সোডা দিয়ে ধুয়ে থায়োকোহলকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে গন্ধ মুক্ত করা হয়। অনেক সময় কস্টিক সোডা দ্রবণের পরিবর্তে সোডিয়াম প্লাম্বাইট দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে গ্যাসোলিনের থায়োকোহলকে ডাইসালফাইডে পরিণত করেও গন্ধ দূর করা হয়।

সোডিয়াম প্লাম্বাইটের পরিবর্তে কিউপ্রিক ক্লোরাইড বা সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট ব্যবহারে একই ফল পাওয়া যায়। এই ভাবে গ্যাসোলিনের বিশ্রী গন্ধ দূর করার পদ্ধতিকে 'সুইটনিং' (sweeting) করা বলে।

কেরোসিন পরিশোধন

কেরোসিনকে প্রথমে ঘন সালফিউরিক দিয়ে, পরে কস্টিক সোডা এবং জল দিয়ে ধুয়ে পরিশোধন করা হয়। এছাড়া তরল সালফার ডাই-অক্সাইড দিয়ে কেরোসিনের সালফার যৌগ এবং অ্যারোম্যাটিক যৌগ দূর করা হয়। এতে কেরোসিন বর্ণহীন ও বিশ্রী গন্ধ মুক্ত হয়। এবং কেরোসিন জ্বলাকালে কম ভূসাকালি সৃষ্টি হয়।

ডিজেল তেল পরিশোধন

তরল সালফার ডাই-অক্সাইড দিয়ে ডিজেল তেলকে ধুয়ে সালফার যৌগ দূর করা হয়।

ভঞ্জন

পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতনে যে গ্যাসোলিন পাওয়া যায় তার পরিমাণ 20%-এর বেশী নয়। তাই গ্যাসোলিনের চাহিদা মেটানোর জন্য পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতনে প্রাপ্ত উচ্চ স্ফুটনাঙ্কের (উচ্চ আণবিক গুরুত্বসম্পন্ন) হাইড্রোকার্বনকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত কম স্ফুটনাঙ্কের (কম আণবিক গুরুত্বসম্পন্ন) হাইড্রোকার্বনে পরিণত করাকে ভঞ্জন বলে। এই ভঞ্জন অনুঘটকের সাহায্যে বা সাহায্য ছাড়া উচ্চ তাপাঙ্কে করা হয়।

	ভঞ্জন			
উচ্চ আণবিক গুরুত্বসম্পন্ন প্যারাফিন	⟶ কম আণবিক গুরুত্বসম্পন্ন প্যারাফিন	+	অসম্পৃক্ত হাইড্রো-কার্বন বা কার্বন	+ হাইড্রোজেন

উচ্চ আণবিক গুরুত্বসম্পন্ন কোন প্যারাফিন থেকে ভঞ্জনে প্রাপ্ত পদার্থগুলি তাপমাত্রা, অনুঘটকের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি, চাপ এবং প্যারাফিনের গঠনের ওপর নির্ভরশীল। ভঞ্জন দুরকম হতে পারে—(i) তাপভঞ্জন (thermal cracking), (ii) অনুঘটক ভঞ্জন (catalytic cracking)।

তাপভঞ্জন

পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতনে প্রাপ্ত উচ্চ স্ফুটনাঙ্কের জ্বালানিকে (যা অপেক্ষাকৃত উচ্চ আণবিক গুরুত্বসম্পন্ন প্যারাফিন) কুণ্ডলী আকৃতি পাইপে 400°–600°C-এ এবং অধিকচাপে (50 – 1000 পাউণ্ড প্রতি বর্গ ইঞ্চি) তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত করে বিক্রিয়া কক্ষে ঢেলে দেওয়া হয়। এখানে বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়। পরে ভঞ্জনকৃত তরলকে আংশিক পাতন করে গ্যাসোলিন ইত্যাদি বিভিন্ন স্ফুটনাঙ্কের তরল জ্বালানিকে পৃথক করা হয়।

উচ্চ তাপাঙ্কে কেরোসিন তেলকে তাপভঞ্জনে গ্যাসীয় জ্বালানিতে পরিণত করে বিভিন্ন রসায়নাগারের গ্যাস বার্নারে ব্যবহার করা হয়। আজকাল কেরোসিনের পরিবর্তে পেট্রোল ব্যবহার করা হচ্ছে।

অনুঘটক ভঞ্জন

তাপ ভঞ্জন থেকে অনুঘটক ভঞ্জন অনেক বেশী উপযোগী। অনুঘটক ভঞ্জনে অনুঘটকের উপস্থিতিতে অনেক কম চাপে করা যায় এবং অবাঞ্ছিত পদার্থের উৎপাদনও অনেক কম হয়। অনুঘটক হিসেবে প্রকৃতিতে প্রাপ্ত বিশেষ ধরনের মাটি বা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত অ্যালুমিনা সিলিকা মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়।

অনুঘটক মিহি গুঁড়ো অবস্থায় ভঞ্জনে ব্যবহার করা হয়, যাতে ভঞ্জনের পর অনুঘটক উৎপন্ন তরলের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারে। এই অনুঘটককে পৃথক করে সক্রিয় করার পর পুনরায় ব্যবহার করা যায়। অনুঘটক ভঞ্জনে প্রাপ্ত তরলকে আংশিক পাতনে গ্যাসোলিন ইত্যাদি পৃথক করা হয়।

ভঞ্জনের দ্বারা প্রাপ্ত বিভিন্ন গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন থেকে নানা প্রকার প্রয়োজনীয় জৈবযৌগ প্রস্তুত করা যায়। যাদের আমরা পেট্রোরাসায়নিক যৌগ (petro chemicals) বলি।

স ং শ্লে ষ ণ-পে ট্রো ল

পৃথিবীতে পেট্রোলিয়ামের সঞ্চয় সীমিত। কিন্তু মোটর গাড়ী, জেট বিমান ইত্যাদির জন্য প্রতিদিনই পেট্রোলের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে। এই চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন উপায়ে পেট্রোল সংশ্লেষণ করা হচ্ছে। (i) কম তাপমাত্রায় কয়লাকে কার্বনীকরণ (low temperature carbonization) দ্বারা, (ii) ফিশার-ট্রপ্স্চ পদ্ধতি (Fischer Tropsch process) দ্বারা, (iii) বার্জিয়াস পদ্ধতি বা কয়লার হাইড্রোজিনেশন দ্বারা।

(i) কম তাপমাত্রায় (300°—500°C) কয়লাকে কার্বনীকরণে (অন্তর্ধূম পাতন) যে আলকাতরা (tar) পাওয়া যায় তাতে প্রচুর পরিমাণে প্যারাফিন হাইড্রোকার্বন থাকে। এই আলকাতরাকে আংশিক পাতনে গ্যাসোলিন ডিজেল তেল ইত্যাদি পাওয়া যায়।

(ii) ফিশার ট্রপ্স্চ পদ্ধতিতে উত্তপ্ত কয়লার মধ্য দিয়ে জলীয়বাষ্প পাঠিয়ে যে ওয়াটার গ্যাস উৎপন্ন হয় তার সঙ্গে অর্ধেক আয়তন হাইড্রোজেন গ্যাস মেশালে তাকে সংশ্লেষণ গ্যাস (synthesis gas) বলে। এই সংশ্লেষণ গ্যাসকে 200°—300°C-এ এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে বা তার অধিক চাপে অনুঘটকের ওপর পরিচালিত করে যে উৎপন্ন বস্তু পাওয়া যায়, তাকে আংশিক পাতনে গ্যাসোলিন, ডিজেল, কেরোসিন ইত্যাদি পাওয়া যায়। অনুঘটক হিসেবে ধাতব কোবাল্টের গুঁড়ো, থোরিয়া (ThO_2) কিসেলগারের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়।

(iii) বার্জিয়াস পদ্ধতিতে কয়লাকে গুঁড়ো করে উচ্চ স্ফুটনাঙ্কের তেল (যা পেট্রোলিয়ামের পাতনে পাওয়া যায়) বা গুরুভার তেল (heavy oil) দিয়ে মেখে লেইয়ের মত করা হয়। 250 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে 400°—500°C-এ অনুঘটকের উপস্থিতিতে কয়লার এই লেইকে হাইড্রোজেন দিয়ে হাইড্রোজিনেশন করা হয়। এতে যে তরল পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাকে আংশিক পাতনের পেট্রোল, মধ্যম গুরুভার সম্পন্ন তেল (middle oil) এবং গুরুভার তেল পাওয়া যায়। অনুঘটক হিসেবে জৈব টিন যৌগ এবং মলিবডেনাম যৌগ ব্যবহার করা হয়। মধ্যম গুরুভার

তেলকে ভঞ্জনে অধিক পরিমাণে পেট্রোল পাওয়া যায়। এবং উৎপন্ন গুরুভার তেল কয়লার সঙ্গে মিশিয়ে লেই প্রস্তুত করা হয়।

যে দেশে প্রচুর পরিমাণ ভালোজাতের কয়লা আছে সেই দেশেই সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে পেট্রোল প্রস্তুত সম্ভব।

তেলযুক্ত কাদা-পাথর

কঠিন ও দাহ্য জৈব যৌগ মিশ্রিত মিহিদানার পাললিক শিলাকে অয়েল সেল (Oil shale) বা তেলযুক্ত কাদাপাথর বা শিলাজতুময় পাথর বলে। ঐ জৈব যৌগকে কেরোজেন (kerogen) বলে, যা বিশেষত জটিল আণবিক সংকেত বিশিষ্ট হাইড্রোকার্বন। অবশ্য কেরোজেনে কখন কখন নাইট্রোজেন, সালফার এবং অক্সিজেন ঘটিত জৈব যৌগও বর্তমান থাকে। কেরোজেন বাদামী থেকে গাঢ় ধূসর বা কালো রঙের হতে পারে। অয়েল সেলে বিভিন্ন ধাতু অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। কোন কোন অঞ্চলের অয়েল সেলে তামা, ইউরেনিয়াম এবং ভ্যানাডিয়াম ধাতু পাওয়া যায়। আর্সেনিক, অ্যাণ্টিমনি থেকে আরম্ভ করে জিংক, রূপো, সোনা ইত্যাদি ধাতুও অয়েল সেলে পাওয়া যায়। সুইডেনে প্রাপ্ত অয়েল সেল (যার নাম অ্যালামসেল) অ্যাল্টামেরিন প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়।

কেরোজেন পেট্রোলিয়াম দ্রাবকে অদ্রাব্য, কিন্তু অক্সিজেন বা বাতাসের অনুপস্থিতিতে প্রায় 500°C-এ উত্তপ্ত করলে (অন্তর্ধূম পাতনে) কেরোজেন বিয়োজিত হয়ে সান্দ্র তরলে পরিণত হয়। এই তরলকে সেল অয়েল বা তেল বলে। এই অন্তর্ধূম পাতনে গ্যাস ও কোক পাওয়া যায়। অয়েল সেলে তেল তরল অবস্থায় থাকে না। কিন্তু রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার পর এর থেকে তেল (তরল অবস্থায়) পাওয়া যায় বলে এই তেলকে 'সাংশ্লেষিক কাঁচা তেল' (Synthetic Crude oil) বলে। উপাদানের বৈশিষ্ট্যের ওপর এই অয়েল সেলের এক একটা নাম আছে—যেমন বিটুমিনাস সেল, কোলি সেল (Coaly shale), লিগনাইট সেল, গ্যাস সেল, কেরোজেন সেল ইত্যাদি। অয়েল সেলও একধরনের জীবাশ্ম জ্বালানি।

অয়েল সেল থেকে প্রাপ্ত তেলকে প্রাচীনকালে ওষুধে ব্যবহার করা হতো। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে পাথর থেকে তেল নিষ্কাশনের কথা উল্লেখ আছে। 1838 খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে অয়েল সেল থেকে শক্তি উৎপাদন হয়েছে। এরপর স্কটল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, রাশিয়া ইত্যাদি দেশে অয়েল সেল থেকে বাণিজ্যিকভাবে তেল উৎপাদন শুরু হয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে আরব দুনিয়া থেকে সস্তায় ও সহজে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যেতে আরম্ভ হলে এই অয়েল সেল থেকে তেল

নিষ্কাশন শিল্প দারুণভাবে মার খায় এবং এই শিল্প প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পেট্রোল ও পেট্রোলিয়াম জাত অন্যান্য বস্তুর চাহিদা এমন বেড়ে গেল যে আবার অয়েল সেল থেকে তেল নিষ্কাশনের দিকে ঝোঁক গেল পৃথিবীর নানা দেশের। অনেক দেশে এই শিল্পের উৎপাদন শুরু করেও কয়েক বছর পর বন্ধ করে দেয়। কারণ তখন সস্তায় পেট্রোলিয়াম পাওয়া যেত।

বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সম্পর্কহীন অবস্থায় সমুদ্র ও হ্রদের বদ্ধজলের পলিতে জৈব বস্তুর (organic matter) লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ভূ-রাসায়নিক (geo-chemical) বিযোজন ও পরিবর্তনের ফলে অয়েল সেলের উৎপত্তি। অয়েল সেলের সঙ্গে কোয়ার্টজ, পাইরাইটস ইত্যাদি সব সময় পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন ধাতুও পাওয়া যায় (আগে উল্লেখ আছে)।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে (কলোরেডো, উটাহ, উইয়োমিংয়ে [Wyoming]), রাশিয়ায় (ইস্টোনিয়াম), চীনে (মানচুরিয়ায়), মেক্সিকো, ফ্রান্স, জার্মানী, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড ইত্যাদি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অয়েল সেল পাওয়া যায়। পৃথিবীতে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়ামের সঞ্চয় আছে প্রায় 1×10^{11} টন (tonnes)। আর অয়েল সেল থেকে যে পরিমাণ তেল পাওয়া যাবে তার পরিমাণ। $1{\cdot}3 \times 10^{11}$ টন। অর্থাৎ অয়েল সেল থেকে অনেক বেশী পরিমাণে তেল পাওয়া যাবে। যদিও অয়েল সেল থেকে তেল পাওয়ার পরিমাণ বেশী হলেও এর উৎপাদন ব্যয় বেশ বেশী বলে অর্থনৈতিক দিক থেকে খুব একটা লাভজনক নয়। প্রতিটন অয়েল সেল থেকে 5—100 গ্যালন পরিমাণ তেল পাওয়া যায়।

অয়েল সেল থেকে দুভাবে তেল নিষ্কাশন করা হয়। প্রথমত ঠিক কয়লার মত খনি থেকে কেটে অয়েল সেলকে ওপরে এনে গুঁড়ো করা হয়। বকযন্ত্রে (retort) অয়েল সেলের গুঁড়ো নিয়ে বাতাসের অবর্তমানে উত্তপ্ত করা হয় এবং এতে অপরিশোধিত তেল পাওয়া যায়। অপরিশোধিত তেলকে পরিশোধনের দ্বারা বিভিন্ন মানের তেল প্রস্তুত করা হয়।

আর একটা পদ্ধতি হলো খনি গর্ভে অয়েল সেলকে ড্রিল করে ভেঙ্গে আগুন দিয়ে উত্তপ্ত করা হয়। এতে উৎপন্ন গ্যাসীয় পদার্থ পুড়ে যাওয়ার পর বাষ্পে পরিণত হয়ে পরে ঘনীভূত হয়ে খনি গর্ভে তরল হিসেবে সঞ্চিত হয়। এই তেলকে পাম্প করে ওপরে তুলে পরিশোধন করা হয়।

উভয় ক্ষেত্রে তাপমাত্রার ওপর তেলের প্রকৃতি, পরিমাণ এবং সঞ্চিত হবার হার নির্ভর করে। কম তাপমাত্রায় উৎপাদিত অপরিশোধিত তেলে অলিফিনের থেকে প্যারাফিনের পরিমাণ বেশী থাকে। মধ্যম তাপমাত্রায় অলিফিনের পরিমাণ বাড়বে এবং অধিক তাপমাত্রায় উৎপাদিত তেলে প্রায় সবটাই অ্যারোম্যাটিক যৌগ। কম

তাপমাত্রায় পাতনের সময় বেশী লাগে এবং তাপমাত্রা বাড়লে পাতনের সময় কম লাগে। সাধারণত 500°C-এ পাতন করা হয়। এই তাপমাত্রায় মাত্র দশমিনিটে অন্তর্ধূম পাতন বিক্রিয়া শেষ হয়ে যায়। কিন্তু 350°C-এ প্রায় একশ ঘণ্টা লাগে, আবার 650°C-এর ওপর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড লাগে।

অপরিশোধিত তেলকে পরিশোধনে গ্যাসোলিন, জেট জ্বালানি, মোটর জ্বালানি, তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস (L P G), ডিজেল তেল এবং অবশিষ্ট তেল (residual oil) ইত্যাদি পাওয়া যায়। এছাড়া উপজাত বস্তু হিসেবে অ্যামোনিয়া, কোক, পিচ, অ্যাসফ্যাল্ট, অ্যারোম্যাটিক যৌগ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

সেল অয়েল প্রায় পেট্রোলিয়ামের মত। তাই পেট্রোমিয়ামের পরিশোধনের মত সেল অয়েলকে পরিশোধন করা হয়। তবে সেক্ষেত্রে পেট্রোলিয়াম পরিশোধন যন্ত্রের কিছু অদল বদল করে নিলেই চলে। সেল অয়েল পরিশোধনে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের তেল বিমান, মোটর, জেট, ডিজেল ইঞ্জিনে ব্যবহার করা চলে এবং প্রাপ্ত গ্যাসকে গ্যাসীয় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা চলে। আর পরিত্যক্ত বস্তু থেকে সালফার, তামা, ইউরেনিয়াম, অ্যালুমিনা ইত্যাদি উপজাত হিসেবে উদ্ধার করতে পারলে উপাদন ব্যয় কম হবে।

অয়েল সেল থেকে তেল নিষ্কাশনের পর শতকরা আশীভাগেরও অধিক কঠিন পরিত্যক্ত বস্তু পাওয়া যায়। এই বস্তু ফেলার জায়গা নিয়ে একটা বিরাট সমস্যা। কারণ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অয়েল সেল থেকে তেল উৎপাদনে বিরাট পরিমাণ অয়েল সেল খনি থেকে তুলতে হবে এবং এর থেকে যে বিরাট পরিমাণ পরিত্যক্ত বস্তু উৎপন্ন হবে তার পরিবহণ ব্যয়ও নেহাৎ কম নয় এবং এই পরিত্যক্ত বস্তু থেকে জল বাতাস দূষিত হবার সম্ভবনা প্রচুর। অয়েল সেল থেকে তেল পেতে অন্তর্ধূম পাতন করতে হয় এবং তেলের বাষ্পকে ঘনীভবনের জন্য প্রচুর পরিমাণে জল শীতলীকরণ যন্ত্রে ব্যবহার করতে হয়। প্রচুর পরিমাণে জলের জোগানও অন্যতম প্রধান সমস্যা এবং ব্যবহৃত জল নানাভাবে পরিবেশকে দূষিত করতে পারে। খনি থেকে অয়েল সেল তুলতে এবং গুঁড়ো করতে, অন্তর্ধূম পাতনে এবং উৎপন্ন পরিত্যক্ত বস্তুকে পরিবহণে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন। আর উৎপন্ন তেলের একটা মোটা অংশ একাজে ব্যয় করতে হয়। তাই অয়েল সেল থেকে তেল নিষ্কাশন খুব একটা আশাপ্রদ নয়। খনিগর্ভে অয়েল সেলকে উত্তপ্ত করে তেল নিষ্কাশনে অয়েল সেল তোলা এবং পরিবহণের খরচ না লাগলেও এই পদ্ধতির নানান অসুবিধা আছে।

আজকাল জীবাশ্ম জ্বালানির দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে অয়েল সেল থেকে তেল নিষ্কাশন ক্রমশ লাভজনক হয়ে উঠবে। আর কয়লা, পেট্রোলিয়াম এবং

প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার যত শূন্য হয়ে আসবে তত আমাদের এই ভাণ্ডারের দিকে হাত বাড়াতে হবে শক্তির প্রয়োজনে। এর মধ্যে যদি অন্য উপায়ে সস্তায় শক্তির উৎস খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে অবশ্য অন্য কথা।

আলকাতরা বা তেলযুক্ত বালি

বিটুমেন নামক হাইড্রোকার্বন যুক্ত আলগা বা প্রায় দৃঢ় বেলেপাথর, চুনাপাথরকে আলকাতরা বালি (Tar Sand) বলে। বিটুমেন হলো অতিসান্দ্র (আঠালো) বা কঠিন আকারের অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম। বিটুমেনকে পেট্রোলিয়ামের মত পাইপের সাহায্যে খনি থেকে উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব। তেলযুক্ত বালি, (Oil Sand) বিটুমেন বালি বা শিলা, আর আলকাতরা বালি একই বস্তু। এই ধরনের বালি বা শিলার থেকে প্রাপ্ত অপরিশোধিত তেলকে 'সাংশ্লেষিক অপরিশোধিত তেল' (Synthetic crude oil) বলে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এর থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর তরল জ্বালানি প্রস্তুত করা যায়।

কানাডা, ভেনেজুয়েলা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রুমানিয়া, রাশিয়া, মাদাগাস্কার, আলবেনিয়া, ট্রিনিদাদ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে আলকাতরা বালি পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কানাডার অ্যালবার্টা (Alberta) অয়েল স্যাণ্ড সঞ্চয়টি বৃহত্তম এবং বিখ্যাত। অ্যালবার্টা অয়েল স্যাণ্ড ভাণ্ডারটি আসলে চারটি সঞ্চয়ের সমষ্টি। এদের মধ্যে বিখ্যাত হলো অ্যাথাবাস্কা টার স্যাণ্ড (Athabasca Tar Sands)। অ্যালবার্টার টার সাণ্ডের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ 111×10^9 মিটার^3। এর পরের স্থানে আছে ভেনেজুয়েলার অরিনিকো (Orinico) পেট্রোলিয়াম অঞ্চলের টার স্যাণ্ড সঞ্চয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান তৃতীয় এবং উটাহ (Utah) অঞ্চলের সঞ্চয়টি এখানকার বৃহত্তম। রাশিয়ার টার স্যাণ্ড সঞ্চয়টি আছে সাইবেরিয়ায়। আর মাদাগাস্কার-এ এই বালির সঞ্চয়টি বেশ ভাল।

কানাডার অ্যালবার্টা সঞ্চয়ের মধ্যে অ্যাথাবাস্কা অঞ্চলের টার স্যাণ্ড থেকে কেবলমাত্র অপরিশোধিত তেল নিষ্কাশন করা হয়। এখানে দৈনিক 125000 ব্যারেল তেল উৎপাদিত হচ্ছে। এই অঞ্চলের টার স্যাণ্ডের ওপরের স্তরের উচ্চতা এক এক স্থানে এক এক রকম। এই স্তরের উচ্চতা খুব কম হলে অর্থাৎ টার স্যাণ্ড সঞ্চয়টি ভূপৃষ্ঠের নিকটে থাকলে ওপরের স্তর সরিয়ে ফেলে টার স্যাণ্ড সংগ্রহ করা হয়। এই বালি উত্তপ্ত করে বিটুমেন সংগ্রহ করা হয়।

অনেক সময় পাইপের সাহায্যে গরম জল বা বাষ্প খনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে

দেওয়া হয়। ফলে উত্তাপে বিটুমেনের সান্দ্রতা কমে যায় এবং পরে পাইপের সাহায্যে এই তরল বিটুমেনকে ওপরে তোলা হয়।

এ ছাড়া উত্তপ্ত বায়ু খনি গর্ভে প্রবেশ করিয়ে দহনের দ্বারা বিটুমেনের অপেক্ষাকৃত উদ্বায়ী অংশকে বাষ্পীভূত করে পাইপের সাহায্যে নিষ্কাশন করা হয়। কোক যেটা থাকে সেটা খনিগর্ভের জ্বালানি হিসেবে কাজ করে।

উৎপাদিত বিটুমেন থেকে পেট্রোলিয়ামের মত পরিশোধন করে গ্যাসোলিন এবং অন্যান্য তরল জ্বালানি প্রস্তুত করা হয়।

ভেনেজুয়েলার টার স্যাণ্ড খনিতে লঘু তেল প্রবেশ করিয়ে সান্দ্র বিটুমেনকে লঘু করে নিষ্কাশন করা হয়। এই অঞ্চল থেকে দৈনিক 40,000 ব্যারেল অপরিশোধিত বিটুমেন নিষ্কাশন করা হয়।

টার স্যাণ্ড থেকে শক্তি উৎপাদনের একটা বিরাট সম্ভাবনা আছে এবং কিছু কিছু জায়গায় পরীক্ষামূলকভাবে উৎপাদনেও শুরু হয়েছে। তবে এই উৎস থেকে জ্বালানি উৎপাদনের প্রধান অসুবিধা হলো উপযুক্ত প্রযুক্তি। এই শিল্পের প্রযুক্তিটা এখনও প্রাথমিক অবস্থায় আছে। তাই অর্থকরী দিক থেকে কতটা উপযুক্ত হবে তা অনুমান করা শক্ত। যদিও অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প হিসেবে উৎসটি মন্দ নয়। টার স্যাণ্ডকে খনি থেকে তুলে, বিটুমেন উদ্ধারে প্রয়োজন প্রচুর জ্বালানি এবং জল। জ্বালানিটা অপরিশোধিত বিটুমেন থেকে পাওয়া গেলেও জলের সমস্যা রয়েই যায়। বিটুমেন নিষ্কাশনে পরিত্যক্ত অবশিষ্ট পদার্থ ফেলার একটা সমস্যা আছে এবং এর থেকে পরিবেশ দূষিত হবার সমস্যাও আছে।

খনিগর্ভ থেকে বিটুমেন উদ্ধার করলে ভূগর্ভস্থ জল ঐ খনিগর্ভে প্রবেশ করে আশেপাশের জলাশয়ের জল দূষিত করতে পারে। এটাও কম সমস্যার কথা নয়।

তবে টার স্যাণ্ড থেকে বিটুমেন উদ্ধার করার প্রক্রিয়াটা অপেক্ষাকৃত সহজ।

পারমাণবিক শক্তি

1905 খ্রীষ্টাব্দে আইনস্টাইন তাঁর ভর ও শক্তি সংক্রান্ত বিখ্যাত সমীকরণ $E=mc^2$ প্রকাশ করেন। আর 1911 খ্রীঃ রাদারফোর্ড পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যা করেন। কোয়ানটাম তত্ত্বের সাহায্যে নীলস্ বোর পরমাণুর কক্ষে অবস্থিত ইলেকট্রনের অরবাইটাল শক্তি নির্দেশ করেন। 1932 খ্রীঃ চ্যাডউইক নিউট্রন আবিষ্কার করেন। ককক্রাফ্ট (Cockcraft) এবং ওয়ালটন (Walton) ঐ একই বছর গতি সম্পন্ন প্রোটনের সাহায্যে লিথিয়াম পরমাণু ভাঙ্গতে সমর্থ হন।

1933 খ্রীঃ ফারমি (Fermi) ধীরগতি সম্পন্ন নিউট্রনের সাহায্যে পরমাণুর কেন্দ্রীণের পরিবর্তনে সমর্থ হন। 1938 খ্রীঃ অটোহান (Ottohahn) এবং ফ্রিটজ স্ট্রসম্যান (Fritz Strassmann) প্রথম পারমাণবিক বিভাজন করেন। লিসে মাইটনার (Lise Meitner) এবং অটো ফিস্‌চ (Otto Frisch) এই বিভাজন ব্যাখ্যা করেন। 1942 খ্রীঃ এনরিকো ফারমি (Enrico Fermi) এবং তাঁর সহকর্মীরা প্রথম সচল ও নিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটাতে সফল হন। এই ভাবে বিভিন্ন দেশের বহু গবেষকদের ধারাবাহিক গবেষণার ফলে বিভাজনের দ্বারা পারমাণবিক শক্তি (Nuclear energy) উৎপাদন সম্ভব হয়েছিল এবং আজ ভারতসহ বহুদেশ এই শক্তি উৎপাদন করছে।

পরমাণুর কেন্দ্রীণে অবস্থিত বিভিন্ন উপপারমাণবিক (subatomic) কণার পুনর্বিন্যাসের দ্বারা উদ্ভূত শক্তিকে সাধারণভাবে পারমাণবিক শক্তি (atomic energy) বলে। এই শক্তিকে নিউক্লীয় শক্তি বলাই উচিত।

পা র মা ণ বি ক বি ভা জ ন

বিভাজনীয় (fissionable) এবং বিভাজন উপযোগী কৃত্রিম মৌল বা তাদের সমস্থানিকদের নিউক্লীয় শক্তি উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়। অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন α-কণা, প্রোটন, ডয়টেরন, নিউট্রন ইত্যাদি উপপারমাণবিক কণার আঘাতে গুরুভার মৌলের কেন্দ্রীণের বিভাজন করা যায়। এদের মধ্যে নিউট্রনই কেবল বিক্রিয়াটিকে নিজের থেকে সচল রাখতে পারে। অর্থাৎ Self-sustaining বিক্রিয়া ঘটাতে পারে।

গুরুভার মৌলের কেন্দ্রীণকে নিউট্রন দিয়ে আঘাতে দুরকম ফল পাওয়া যেতে পারে। যেমন—(i) মৌলের কেন্দ্রীণ কর্তৃক নিউট্রন আত্তীকরণ বা আবন্ধন (Capture) এবং এই আত্তীকরণের ফলে অতিরিক্ত প্রচুর শক্তি γ-রশ্মি হিসেবে নির্গত হয়। আত্তীকরণে নিউট্রনের সংখ্যা কমে যায় বলে কেন্দ্রীণের বিভাজনের সম্ভাবনা কমে যায়। (ii) নিউট্রনের আঘাতে কেন্দ্রীণ ভেঙ্গে যেতে পারে। একে আমরা পারমাণবিক বিভাজন বা কেন্দ্রীণের বিভাজন বলি। এর ফলে প্রতি বিভাজনে এক বা একাধিক নিউট্রন এবং প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন নিউট্রন পুনরায় আত্তীকরণ বা বিভাজনে অংশ নিতে পারে। আত্তীকরণ হবে না বিভাজন হবে সেটা নির্ভর করে নিউট্রনের আঘাত করার শক্তির ওপর এবং পরমাণুর কেন্দ্রীণের ওপর। নিউট্রনের আত্তীকরণ বা নিউট্রনের দ্বারা কেন্দ্রীণের বিভাজন উভয় প্রকার বিক্রিয়াকে পারমাণবিক বিক্রিয়া (nuclear reaction) বলে।

পারমাণবিক বিক্রিয়ায় কেন্দ্রীণকে স্থির অবস্থায় রেখে গতি সম্পন্ন উপপারমাণবিক কণা দিয়ে আঘাত করা হয়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীণ লক্ষ্য বস্তু (target)

এবং আঘাতকারী কণা হল প্রাস (projectile)। কেন্দ্রীণে ধনাত্মক আধান থাকায় যে কোন ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট কণা দিয়ে কেন্দ্রীণকে আঘাত করলে বিকর্ষণ হবে। তাই এই সব ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট কণা দিয়ে কেন্দ্রীণকে সত্যিই আঘাত করতে হলে এই বিকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করতে হবে। অর্থাৎ এই সব কণায় গতিশক্তি খুবই বেশী থাকা দরকার। কিন্তু নিউট্রন আধান বিহীন বলে কেন্দ্রীনের দ্বারা বিকর্ষণ হয় না। ফলে নিউট্রন দিয়ে কেন্দ্রীণকে আঘাত করতে হলে গতিশক্তি খুব একটা বেশী হয় না।

পারমাণবিক বিক্রিয়ার উদাহরণ

$U^{235}+n \rightarrow U^{236}+\gamma$ 1

$U^{235}+n \rightarrow$ বিভাজিত বস্তু $+2{\cdot}47n$ 2

$U^{238}+n \rightarrow U^{239}+\beta^{-}$ 3

$U^{239} \rightarrow Np^{239}+\beta^{-}$ 4

$Np^{239} \rightarrow Pu^{239}+\beta^{-}$ 5

$Pu^{239}+n \rightarrow$ বিভাজিত বস্তু $+2{\cdot}88n$ 6

$Th^{232}+n \rightarrow Th^{233}+\gamma$ 7

$Th^{233} \rightarrow Pa^{233}+\beta^{-}$ 8

$Pa^{233} \rightarrow U^{233}+\beta^{-}$ 9

U=ইউরেনিয়াম, n=নিউট্রন, Np=নেপচুনিয়াম, Pu=প্লুটোনিয়াম, Th=থোরিয়াম, Pa=প্রোট্যাক্টীনিয়াম, β^{-}=ইলেকট্রন,

U—235=ইউরেনিয়াম যার পারমাণবিক ভর সংখ্যা 235।

1, 3 এবং 7 নং বিক্রিয়াগুলি হলো নিউট্রন আত্তীকরণ বিক্রিয়া এবং

2 ও 6 নং বিক্রিয়া হলো পারমাণবিক বিভাজন বিক্রিয়া।

4, 5, 8, 9 বিক্রিয়াগুলি উর্বর মৌল এবং বিভাজনীয় মৌল উৎপাদন করে।

নিউট্রনের আঘাতে কিছু গুরুভার মৌলের আত্তীকরণ অপেক্ষা বিভাজন বিক্রিয়া হওয়ার প্রবণতা বেশী থাকে। এদের মধ্যে আছে ইউরেনিয়ামের সমস্থানিক 233 ও 235 এবং প্লুটোনিয়াম 239। অনেক মৌলের সমস্থানিক নিউট্রনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে নিউট্রন উৎপাদনে সক্ষম এবং উৎপন্ন এই নিউট্রন শৃঙ্খলা বিক্রিয়ার (Chain reaction) মাধ্যমে পরমাণবিক বিক্রিয়াটি সচল রাখে। এই সকল সমস্থানিক ও মৌলকে পারমাণবিক জ্বালানি (nuclear fuel) বলে। এই পারমাণবিক জ্বালানির ব্যবহারে উৎপন্ন তাপের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে তাকে পারমাণবিক শক্তি বলে। ইউরেনিয়াম 233 ও 235 এবং প্লুটোনিয়াম 239-এর মধ্যে কেবলমাত্র ইউরেনিয়াম 235 প্রকৃতিতে পাওয়া যায় ইউরেনিয়াম 238-এর

সঙ্গে মাত্র 0·72%। ইউরেনিয়াম 233 এবং প্লুটোনিয়াম 239-কে প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না, এদের কৃত্রিমভাবে নিউট্রনের আত্তীকরণের দ্বারা যথাক্রমে থোরিয়াম 232 এবং ইউরেনিয়াম 238 থেকে প্রস্তুত করা হয়। ইউরেনিয়াম 235-কে বিভাজনীয় (fissile) সমস্থানিক এবং থোরিয়াম 232 এবং ইউরেনিয়াম 238-কে উর্বর মৌল (fertile element) বলে।

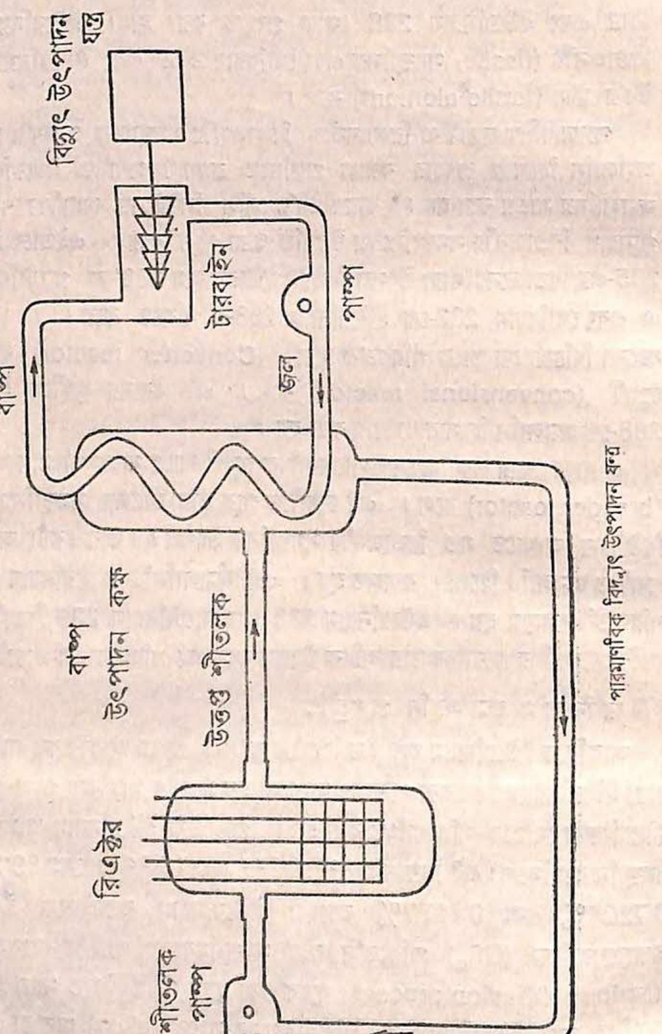
পারমাণবিক চুল্লী বা রিঅ্যাকটরে বিভাজনীয় সমস্থানিক ও উর্বর মৌল একত্রে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করলে প্রকৃতিতে ক্রমশ নিঃশেষিত ইউরেনিয়াম 235 জ্বালানির সাশ্রয় করা হয়। কারণ উর্বর মৌল নিউট্রনের আত্তীকরণের সাহায্যে পুনরায় বিভাজনীয় সমস্থানিকের উৎপত্তি দ্বারা পূর্ণ করে। এইভাবে ইউরেনিয়াম 235-এর বিভাজনের দ্বারা উৎপন্ন নিউট্রন ইউরেনিয়াম 238-কে প্লুটোনিয়াম 239-এ এবং থোরিয়াম 232-কে ইউরেনিয়াম 233-এ পরিণত করে। যে চুল্লীতে এই ধরনের বিক্রিয়া হয় তাকে পরিবর্তক চুল্লী (Converter reactor) বা প্রচলিত চুল্লী (convensional reactor) বলে। এই ধরনের চুল্লীতে ইউরেনিয়াম 235-কে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

এ ছাড়া আর এক ধরনের পারমাণবিক চুল্লী আছে যাকে পরিমাণবর্ধক চুল্লী (breeder reactor) বলে। এই চুল্লীতে গুরুভার মৌলের সমস্থানিকের ওপর নিউট্রনের আঘাতে যত বিভাজনীয় সমস্থানিক উৎপন্ন হয় তার একটা অংশমাত্র ঐ চুল্লীতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই জ্বালানিটি ইউরেনিয়াম 235-এর পরিবর্তে ব্যবহার হয়। ইউরেনিয়াম 233 এবং প্লুটোনিয়াম 239 বিভাজিত হতে যতটা জ্বালানির প্রয়োজন তার অধিক উৎপন্ন করে এই পরিমাণবর্ধক চুল্লীতে।

ইউরেনিয়াম জ্বালানি প্রস্তুতি

আকরিকে ইউরেনিয়াম অক্সাইড হিসেবে থাকে। প্রথমে আকরিকের গাঢ়ীকরণের দ্বারা ইউরেনিয়ামের শতকরা পরিমাণ বাড়ানো হয়। পরে গাঢ়ীকৃত ও অপরিশোধিত ইউরেনিয়াম যৌগকে পরিশোধিত করা হয়। প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম আসলে তিনটি সমস্থানিকের মিশ্রণ। এই মিশ্রণে U^{238}, U^{235} এবং U^{234} যথাক্রমে 99·2739%, 0·7204% এবং 0·0057% আছে। ইউরেনিয়াম অক্সাইডকে ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইডে (UF_6) পরিবর্তন করে সমস্থানিকদের গ্যাসীয় ব্যাপন প্রক্রিয়ায় (gasious diffusion process) পৃথক করা হয়। এই উন্নত মানে UF_6-কে বিজারিত করে ইউরেনিয়াম বা ইউরেনিয়ামের সংকর (alloy) ধাতু বা এর থেকে ইউরেনিয়ামের যৌগ প্রস্তুত করা হয়। ধাতব ইউরেনিয়াম বা এর অক্সাইডের পিলেট অ্যালুমিনিয়াম বা স্টেনলেশ বা জিরকালয় টিউবে ভর্তি করা হয়। টিউবগুলি সীল করার পর ওয়েল্ডিং করে বাণ্ডিল করা হয়। পারমাণবিক

চুল্লীতে ইউরেনিয়াম বাণ্ডিল আকারে রাখা হয়। বাণ্ডিলে যেন কোন ছিদ্র না থাকে। চুল্লীর অভ্যন্তরে শীতলক (Coolant) প্রবাহিত করার ব্যবস্থা থাকে।



পরমাণবিক চুল্লীতে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রচলিত চুল্লীতে এ সুবিধা নেই।

প্রতিটি বাণ্ডিলে 50টি টিউব থাকে। প্রত্যেকটি টিউব প্রায় 14 ফুট লম্বা হয়। এই রকম প্রায় 700 বাণ্ডিল দিয়ে চুল্লীর অভ্যন্তরটি সাজানো হয়। বিভাজন শুরু হলে পারমাণবিক জ্বালানির দহনে সৃষ্টি হয় প্রচুর তাপ এবং মারাত্মক তেজস্ক্রিয় পদার্থ। বাণ্ডিলে ছিদ্র থাকলে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি করবে। পারমাণবিক জ্বালানির দহনে উদ্ভূত তাপকে চুল্লীর অভ্যন্তর থেকে শীতলকের সাহায্যে পরিবহণ করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয় এবং চুল্লীর তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা হয়। তা না হলে অধিক তাপে চুল্লী ও জ্বালানি পূর্ণ টিউব গলে গিয়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থে চারিদিক ভরে গিয়ে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করবে। শীতলক হিসেবে জল বা গলিত সোডিয়াম ব্যবহার করা হয়। যেহেতু পারমাণবিক বিক্রিয়ায় প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়, অতএব প্রচুর পরিমাণে শীতলক খুব দ্রুত প্রবাহিত করানো দরকার। জলকে শীতলক হিসেবে ব্যবহার করলে, অধিক চাপ প্রয়োগে জলকে ফুটতে দেওয়া হয় না। এই বাষ্প বা উত্তপ্ত সোডিয়ামের (তরল বা গ্যাসীয়) সাহায্যে জলকে বাষ্পীভূত করে সেই বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এক আউন্স পারমাণবিক জ্বালানি প্রায় 100 টন কয়লার সমান শক্তি উৎপাদন করতে পারে।

পারমাণবিক জ্বালানির বিভাজনে ইউরেনিয়াম পরমাণু ভেঙ্গে গিয়ে একাধিক তেজস্ক্রিয় মৌল স্ট্রনশিয়াম 90, সিজিয়াম 137, আয়োডিন 131, ক্রিপ্টন 85, প্লুটোনিয়াম 239, প্লুটোনিয়াম 240, প্লুটোনিয়াম 241 ইত্যাদি ও নিউট্রন উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন নিউট্রন বিক্রিয়াটিকে সচল রাখে। উৎপন্ন অন্যান্য তেজস্ক্রিয় মৌল বিভাজনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বলে এদের সরিয়ে ফেলা দরকার।

বেশ কিছুদিন অন্তর অন্তর চুল্লী বন্ধ করে ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানির বাণ্ডিলগুলির নতুন বাণ্ডিল দিয়ে পাল্টানো হয়। কিন্তু ব্যবহৃত ঐ জ্বালানির কেন্দ্রভাগ অত্যন্ত গরম থাকে এবং এতে তেজস্ক্রিয় মৌল (আবর্জনা) জমা থাকে। এই আবর্জনাকে ব্যবহৃত জ্বালানি সংরক্ষণ কক্ষে বেশ কিছুদিন ডুবিয়ে রেখে ঠাণ্ডা ও কিছুটা নিষ্ক্রিয় করা হয়। পরে এই আবর্জনা থেকে অবিকৃত ইউরে-নিয়ামকে পুনরুদ্ধার করে ব্যবহার করা হয় এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সংরক্ষণ করতে হয়। কারণ পারমাণবিক চুল্লীতে উৎপন্ন প্লুটোনিয়াম—239 বিষাক্ত এবং মারাত্মক তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং এর থেকে পরমাণু বোমা বানানো যায়। আর যে পরিমাণ প্লুটোনিয়াম 239 প্রতি বছর প্রতিটি পারমাণবিক চুল্লীতে জমা পড়ছে, তাতে বেশ ভালো রকম পরমাণু বোমা বানানো যায়। যাদের ধ্বংস ক্ষমতা খুবই প্রচণ্ড। আর একটা ব্যাপার হলো যে প্লুটোনিয়াম 239-এর তেজস্ক্রিয়তা বেশ কয়েকশ হাজার বছর চলে। ফলে কমপক্ষে একলক্ষ বছর ধরে

খুব সতর্কতার সঙ্গে সংরক্ষণ করতে হবে। এ ছাড়া অন্যান্য যে সব তেজস্ক্রিয় মৌল উৎপন্ন হয় যেমন সিজিয়াম 137, স্ট্রনশিয়াম 90, আয়োডিন 131 ইত্যাদি ক্যানসার ও লিউকোমিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

আজ পর্যন্ত এই সকল আবর্জনা সংরক্ষণের তেমন কোন ভালো পথ বাতলানো যায়নি। তাই স্টিলের তৈরী ট্যাংকে করে মাটির নিচে পুঁতে রাখা হচ্ছে। কিন্তু ট্যাংক ফুটো হয়ে গেলে জল ও বাতাস তেজস্ক্রিয়তায় ভরে যাবে। যার পরিণাম জীবজগতের পক্ষে মারাত্মক। আবর্জনা সংরক্ষণে অনেকে অ্যান্টার্টিকার চির তুষার রাজ্যের গভীরে ঐ সকল আবর্জনা পুঁতে রাখার পরিকল্পনা করছে। কারণ ঐ অঞ্চলে মানুষের বাস নেই। কিন্তু এর পরিণামও ভয়ংকর হতে পারে। মহাশূন্যে রকেটের সাহায্যে এই সকল আবর্জনাকে পাঠাবার পরিকল্পনা অনেকের আছে। উপযুক্ত প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তির সাহায্যে ঐ সকল আবর্জনাকে নিরাপদ পদার্থে পরিণত করার চেষ্টাও চলছে।

পারমাণবিক আবর্জনাকে যতদিন না কোন একটা সদগতি করা যাচ্ছে ততদিন একে চুরির হাত থেকে এবং পরিবেশ দূষণের হাত থেকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এবং সাবধানে পাহারার ব্যবস্থা করে সংরক্ষণ করতে হবে।

পারমাণবিক বিভাজনের ফলে চুল্লীর তাপমাত্রা খুব বেশী থাকে। তাই শীতলক হিসেবে জল প্রবাহে তাপ পরিবহণ করে চুল্লীর তাপমাত্রা কম রাখা হয়। এখন কোন কারণে যদি জল প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে চুল্লী বন্ধ করে ফেলা হয়। কিংবা পারমাণবিক আবর্জনা কক্ষে তাড়াতাড়ি ডুবিয়ে ফেলা হয়। যদি তাড়াতাড়ি ডুবিয়ে ফেলা না যায় তবে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে জলে ভাসিয়ে চুল্লীকে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা করা হয়। এ ব্যবস্থা না করলে চুল্লী গলে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। চুল্লীর পারমাণবিক বিক্রিয়া বন্ধ করতে বোরন রড চুল্লীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। এতে পারমাণবিক জ্বালানির বিভাজন বন্ধ হলেও উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় মৌলের (আবর্জনার) বিভাজন বন্ধ হয় না। ফলে চুল্লীর তাপমাত্রা বেড়েই চলে এবং গলে যায় যদি যথাসময়ে জল দিয়ে ঠাণ্ডা করা না হয়।

চুল্লী গলে গেলে উত্তপ্ত ও গলিত জ্বালানি তলায় অবস্থিত আবর্জনা কক্ষে পড়ে যাবে, কিন্তু অত্যন্ত উত্তপ্ত ও মারাত্মক তেজস্ক্রিয় পদার্থের বাষ্পে চারিদিক ভরে যাবে। ফলে তেজস্ক্রিয়তার দরুন ভয়ংকর অবস্থা সৃষ্টি হবে। এই রকম পারমাণবিক দুর্ঘটনা অনেক দেশে ঘটে গিয়েছে।

ভূ-কম্পন, সাইক্লোন, বন্যা, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় যে সব এলাকায় ঘটে বা ঘটবার সম্ভাবনা আছে সেখানে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন

কেন্দ্র বসানো যাবে না। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র সাময়িক বন্ধ করতে বা পুরোপরি বন্ধ করতে খরচ প্রচুর। এমনকি ঐ উৎপাদন কেন্দ্র বসাতে যত খরচ তুলে ফেলতে তার চেয়ে বেশী খরচ হয়। এ ছাড়া দুর্ঘটনা ঘটলে জীবন রক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি ঐ এলাকা খালি করার প্রয়োজন হয়। এতে লোকদের পরিবহণ ও পুনর্বাসন খরচ বিপুল এবং জীবনহানি যদি ঘটে টাকার অংকে তা বিশাল। তাই পাঃ শক্তি উৎপাদন করা গেলেও উৎপাদন ব্যয় নানান কারণে খুব বেশী হবার সম্ভাবনা থাকে এবং সংরক্ষণ ব্যয় খুবই বেশী। এই প্রসঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউক্রেনের শিল্প সমৃদ্ধ শহর কিয়েভের অদূরে অবস্থিত চেরনোবিলের পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে গত 26 এপ্রিল, 1986 তারিখের মারাত্মক দুর্ঘটনার খবর আমরা সংবাদে জেনেছি। বিদ্যুৎ উৎপাদন চুল্লীর ছিদ্রটি ধরা পড়ার আগেই এটিতে আগুন লেগে যায় এবং দারুণ বিস্ফোরণে রিএক্টরের কংক্রীটের ছাদ উড়ে যায়। ফলে মারাত্মক তেজস্ক্রিয় পদার্থ বার হতে থাকে এবং বিশাল এলাকার বাতাস দূষিত হয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলেই বেশকিছু লোক মারা যায় এবং অনুমান করা হচ্ছে মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে। বহু লোক অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং ভবিষ্যতে পড়বে। বহুলোকের ক্যানসার দেখা দেবে। ভবিষ্যতের প্রজন্মদের নানা রকম উপসর্গ দেখা দেবে। দুর্ঘটনা ঘটায় সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে কাজ শুরু হয়ে যায় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হয়। হেলিকপ্টার থেকে কাদামাটি, বালি ইত্যাদি চুল্লীর উপর ফেলা হয়। ঐ কেন্দ্রের আশেপাশের সমস্ত মানুষ ও শিশুদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিতে হয়েছে। কেন্দ্রের চারিপাশের বিশাল এলাকার জল, ফসল, দুধ, খাবার দাবার, আনাজপাতি তেজস্ক্রিয় পদার্থ দ্বারা দারুণভাবে দূষিত হয়ে পড়েছে এবং বহুকাল ধরে ঐ সব পদার্থে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব থাকবে। ফলে ঐসব পদার্থ মানুষ এবং জীব-জন্তুদের ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে এবং বহুকাল ধরে অনুপযুক্ত হয়ে থাকবে।

চেরনোবিলের আগে পারমাণবিক চুল্লীতে এমন দুর্ঘটনা ঘটেছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের থ্রিমাইল আইল্যাণ্ডে 28 মার্চ, 1979। সেখানেও মানুষ মারা গিয়েছিল এবং ক্ষয়ক্ষতি যা হবার হয়েছিল। কিন্তু উৎপাদন কেন্দ্রটি একটি দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত ছিল এবং লোকালয় থেকে দূরে ছিল বলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম হয়েছিল।

থ্রিমাইল আইল্যাণ্ড এবং চেরনোবিলের দুর্ঘটনার পর প্রস্তাবিত পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা আপাতত বন্ধ করে দিয়েছে বহু দেশ এবং যে কেন্দ্রগুলি সচল আছে সেগুলির নিরাপত্তা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

পরিমাণবর্ধক চুল্লী

পরিমাণবর্ধক চুল্লীতে ইউরেনিয়াম—235 সমৃদ্ধ প্লুটোনিয়াম—239 বা ইউরেনিয়াম 238 জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দ্রুতগতি সম্পন্ন অতিরিক্ত নিউট্রন উৎপন্ন হয়। যা U—238-কে Pu—239-এ পরিণত করে এবং উৎপন্ন Pu—239 জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই চুল্লীতে যতটা জ্বালানির প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী জ্বালানি এই দ্রুতগতি সম্পন্ন নিউট্রন দিতে প্রস্তুত হয়। এই চুল্লীর কার্যদক্ষতা 40% যা অন্যান্য গতানুগতিক চুল্লীর (কার্যদক্ষতা 32%) থেকে বেশী। পরিমাণবর্ধক চুল্লীতে জলের বদলে শীতলক হিসেবে তরল সোডিয়াম ব্যবহার করা হয়। এই তরল সোডিয়াম চুল্লীর অভ্যন্তরের তাপ পরিবহণ করে নিয়ে আসে। আর এই উত্তপ্ত সোডিয়ামের তাপের সাহায্যে জলকে বাষ্পে পরিণত করে বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র চালানো হয়ে থাকে।

পিনের আকারে জ্বালানি ছয়কোণা কৌটোয় (ক্যানে) করে চুল্লীর মধ্যে ঠাসাঠাসি করে সাজানো হয়। নিয়ন্ত্রক রড তুলে নিলে চুল্লীর অভ্যন্তরে জ্বালানির মধ্যে নিউট্রন বার হবে এবং U—238-এর সঙ্গে বিক্রিয়ায় Pu—239-ও তাপ উৎপাদন করবে। উৎপন্ন Pu—239-ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়া অনেক কাজে ও গবেষণায় ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন জলকে লবণমুক্ত করতে, কীটপতঙ্গ ধ্বংস করতে এবং খাদ্যশস্য, ফল ও খাদ্য সংরক্ষণে, পারমাণবিক তেজস্ক্রিয় ওষুধ প্রস্তুতিতে, পতঙ্গ, পরজীবী ও অন্যান্য প্রাণীর জেনেটিক্স গবেষণায় ইত্যাদি। এ ছাড়া জল বিজ্ঞান, সমরাস্ত্র প্রস্তুতিতে এবং শিল্পে এই প্রযুক্তি খুবই ব্যবহার করা হচ্ছে।

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্য ইউরেনিয়াম আকরিক খনি থেকে অনেক সহজে আহরণ করা যায়। এ কাজে অল্প পরিমাণ জমি নষ্ট হয় এবং জল দূষণ কম হয়। যেহেতু অল্প পরিমাণ পাঃ জ্বালানি থেকে প্রচুর পরিমাণে শক্তি উৎপাদন করা যায়, তাই অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানির তুলনায় এর পরিবহণ খরচ খুবই কম। জীবাশ্ম জ্বালানির মত এই জ্বালানি থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, কার্বনের কণা বায়ুমণ্ডলে মেশে না। এগুলি এই জ্বালানির সুবিধাজনক দিক। কিন্তু এই জ্বালানির থেকে মারাত্মক সব তেজস্ক্রিয় পদার্থ উৎপন্ন হয়, যাদের তেজস্ক্রিয়তা বহু সহস্র বছর ধরে সক্রিয় থাকে। এই সকল তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে ক্যানসার, লিউকোমিয়া, বিকলাঙ্গ হবার সম্ভাবনা প্রচুর। অন্যান্য জ্বালানির তুলনায় এই জ্বালানি থেকে প্রচুর পরিমাণে তাপ বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে পরিবেশের তাপ দূষণ বাড়াচ্ছে। পাঃ শক্তি উৎপাদনে প্রচুর পরিমাণে জল প্রয়োজন হয়, যা প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। তেজস্ক্রিয় আবর্জনার

সংরক্ষণ খরচ বিপুল। পাঃ শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র বসাতে খরচ যেমন বিশাল, এটি তুলে ফেলতে খরচ তার চেয়ে অনেক বেশী। দুর্ঘটনা হবার সম্ভাবনা খুবই বেশী এবং দুর্ঘটনা একবার ঘটলে তার দরুন ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপক। তাই যুদ্ধের সময় এই সকল কেন্দ্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। তেজস্ক্রিয় আবর্জনা থেকে প্রচুর পাঃ বোমা বানান হচ্ছে এবং যায়। প্রচলিত চুল্লীতে যে U—235 প্রয়োজন তা নিষ্কাশন খরচ বেশ। এবং এই জ্বালানির পরিমাণ পৃথিবীতে কম। তবে পরিমাণবর্ধক চুল্লীতে U—235 এর সঙ্গে U—238 এবং Pu—239 ব্যবহার করে জ্বালানির সাশ্রয় করা হচ্ছে।

পারমাণবিক সম্মিলন শক্তি

সূর্য এবং বিভিন্ন নক্ষত্রে যে প্রচণ্ড শক্তি প্রতিদিন সৃষ্টি হচ্ছে, সেটাও পারমাণবিক শক্তি হলেও পরমাণুর বিভাজনের দ্বারা সৃষ্টি হচ্ছে না। এই শক্তির উৎস হলো পারমাণবিক সম্মিলন বিক্রিয়া। হাল্কা কেন্দ্রীণ বিশিষ্ট দুটি পরমাণুর কেন্দ্রীণের সম্মিলনের ফলে উচ্চতর ভরের কেন্দ্রীণ সৃষ্টি হয়। এই ধরনের পারমাণবিক বিক্রিয়াকে পারমাণবিক সম্মিলন (nuclear fusion) বলে। পাঃ সম্মিলনে প্রচুর তাপ উদ্ভূত হয়। এই সম্মিলন বিক্রিয়াকে সচল রাখতে চাই প্রচণ্ড তাপ এবং চাপ, আর জ্বালানি হিসেবে ভারী হাইড্রোজেন বা ডয়টেরিয়াম এবং ট্রাইটিয়াম প্রয়োজন। এই ডয়টেরিয়াম ট্রাইটিয়ামের সম্মিলন বিক্রিয়া ঘটাতে গেলে প্রয়োজন কম পক্ষে পাঁচ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আমাদের সূর্যে এই তাপ পাঃ সম্মিলন বিক্রিয়া চলছে অবিরাম, যা হলো সৌর শক্তির জোগানদার। দুটি প্রোটিয়াম ($_1H^1$) তাপ পাঃ সম্মিলনে সৃষ্টি করছে ডয়টেরিয়াম ($_1H^2$)। যা কিনা প্রোটিয়ামের সঙ্গে সম্মিলনে হিলিয়াম সমস্থানিক ($_2He^3$) সৃষ্টি হয়। সৃষ্ট এই হিলিয়ামের দুটি কেন্দ্রীণের সম্মিলনের ফলে উৎপন্ন হয় সাধারণ হিলিয়াম ($_2He^4$) এবং দুটি প্রোটন। ডয়টেরিয়াম-ডয়টেরিয়াম বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় ট্রাইটিয়াম ও প্রোটন বা হিলিয়াম-3 এবং নিউট্রন। সেই রকম ট্রাইটিয়াম-ডয়টেরিয়াম বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় হিলিয়াম-4 এবং নিউট্রন। আর এর সঙ্গে উৎপন্ন হয় প্রচুর তাপ। সূর্যে এইভাবে তাপশক্তি সৃষ্টি হচ্ছে। সৃষ্ট এই তাপের একটা অংশ তাপ পাঃ সম্মিলন বিক্রিয়া ঘটাতে ব্যয় হয়। আর এইভাবে সূর্যে সচল থাকবে সম্মিলন বিক্রিয়া যতদিন না জ্বালানির অভাব হয়। সূর্যে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন আছে তাতে 3000 কোটি বছর অনায়াসে চলে যাবে।

বর্তমানে এই পৃথিবীতে যে পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হচ্ছে, তাতে

এই জ্বালানির ভাণ্ডার শেষ হতে খুব একটা দেরী হবে না। তখন কি হবে? তখন কি আমরা আমাদের শক্তির চাহিদা পূরণ করতে পারবো? পাঃ বিভাজন দিয়ে বর্তমানে শক্তির একটি অংশ মাত্র পূরণ হচ্ছে। এই বিভাজন বিক্রিয়ার কতকগুলি বিশেষ অসুবিধা আছে। যা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। কিন্তু পাঃ সম্মিলন বিক্রিয়াকে কাজে লাগাতে পারলে আমরা আমাদের শক্তির চাহিদা পূরণ করতে পারবো। কারণ এই পৃথিবীর জলে প্রতি 6000টি প্রোটিয়ামের সঙ্গে একটি ডয়টেরিয়াম পরমাণু বর্তমান। পৃথিবীতে জলের ভাণ্ডারটি বিরাট। তাই এই সম্মিলন বিক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ডয়টেরিয়াম জ্বালানির অভাব হবে না। ট্রাইটিয়ামকে আমরা পাঃ বিক্রিয়ার দ্বারা প্রস্তুত করতে পারবো। পাঃ বিভাজনের মত এই সম্মিলন বিক্রিয়ায় দীর্ঘ জীবন বিশিষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থের উৎপাদন হয় না। সম্মিলন বিক্রিয়ায় অক্সিজেন প্রয়োজন হয় না এবং এর দরুন কার্বন ডাই-অক্সাইড বা অন্য কোন দহন বস্তুর উৎপাদন হয় না। ফলে পরিবেশ দূষণের কথা ওঠে না। সম্মিলন বিক্রিয়ার সাহায্যে শক্তি উৎপাদনের সপক্ষে এতগুলি ভালোভালো যুক্তি থাকলেও উৎপাদনে প্রচুর কারিগরী ঝামেলা আছে। আর বিজ্ঞানীরা সেই ঝামেলা সমাধানে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

পাঃ সম্মিলন বিক্রিয়ায় অত্যন্ত শক্তি সম্পন্ন দুটি কেন্দ্রীণের সংঘর্ষের ফলে কেন্দ্রীণের প্রোটন নিউট্রনে পুনর্বিন্যাসের ফলে এক বা একাধিক বিক্রিয়াজাত পদার্থ এবং প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়ারত এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থের ভরের পার্থক্য সমান হবে উৎপন্ন তাপের পরিমাণ। উৎপন্ন তাপ বিক্রিয়াজাত পদার্থের গতিশক্তি বাড়ায়। এই বিক্রিয়ায় দুটি পরমাণুর কেন্দ্রীণের সম্মিলন ঘটান হয়। যেহেতু কেন্দ্রীণে থাকে নিউট্রন (প্রোটিয়ামে নিউট্রন থাকে না) এবং প্রোটন। প্রোটনের আধান হলো ধনাত্মক, যা ইলেক্ট্রনের আধানের সমান কিন্তু বিপরীত। সমআধান নিজেরা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। তাই দুটি কেন্দ্রীণের মধ্যে সম্মিলন ঘটাতে গেলে প্রোটনের এই বিকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করাতে হবে। আর কম পাঃ ক্রমাংক বিশিষ্ট মৌলের পরমাণুতে প্রোটনের সংখ্যা কম, অতএব দুটি হাল্কা কেন্দ্রীণের মধ্যে এই বিকর্ষণ শক্তির পরিমাণ বেশী পাঃ ক্রমাংক বিশিষ্ট পরমাণুর কেন্দ্রীণের বিকর্ষণ শক্তির থেকে অনেক কম হবে। তাই পাঃ সম্মিলন বিক্রিয়ায় ভারী হাইড্রোজেন বা ডয়টেরিয়াম (পাঃ ক্রমাংক এক) ব্যবহার করা হয়।

জ্বালানির অভাব না হলে অধিক তাপমাত্রায় পাঃ সম্মিলন বিক্রিয়া নিজের থেকে সচল থাকবে। কারণ অধিক তাপমাত্রায় এই বিক্রিয়ায় জ্বালানি পরমাণুর কেন্দ্রীণ উত্তপ্ত ও আয়নিত হয়ে গ্যাসীয় অবস্থায় এবং পরমাণুর ইলেক্ট্রন মুক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। মুক্ত এই ইলেক্ট্রন ও (আয়নিত) প্রোটনকে প্লাজমা

(plasma) বলে। বিপুল পরিমাণ তাপে অত্যন্ত উত্তেজিত কেন্দ্রীণ নিজেদের মধ্যে বিকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়। ফলে কেন্দ্রীণের সম্মিলন সম্ভব এবং যার ফলে প্রচুর তাপ নির্গত হয়।

পৃথিবীর বহু দেশ এই পাঃ সম্মিলন বিক্রিয়ার দ্বারা শক্তি সমস্যার মোকাবিলা করতে চাইছে। কারণ এর থেকে নিরাপদে প্রচুর শক্তি বহুদিন ধরে পাওয়া যাবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই বিক্রিয়া করানোর মত চুল্লী এখনও তৈরি করা যায়নি। যদিও এ নিয়ে গবেষণার শেষ নেই। চুল্লী প্রস্তুতিতে মোটামুটি দুটি সমস্যায় ঠেকে গেছে। (i) পাঃ সম্মিলন বিক্রিয়ায় জ্বালানিকে উপযুক্ত প্রচণ্ড উত্তাপে উত্তপ্ত করা (প্রায় দশকোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস) এবং (ii) উত্তপ্ত জ্বালানিকে বেশ কিছু সময়ের জন্য আবদ্ধ করে রাখা, যাতে পাঃ সম্মিলন বিক্রিয়া ঘটতে পারে। এবং সম্মিলনের ফলে উদ্ভূত শক্তি যেন জ্বালানিকে বিক্রিয়া তাপমাত্রায় তোলার চেয়ে বেশী হয়। এত বেশী তাপমাত্রায় পার্থিব কোন বস্তুরই কঠিন অবস্থায় থাকা সম্ভব নয়। তাই চুল্লী প্রস্তুত করা একটা বিরাট সমস্যা।

এত অধিক তাপমাত্রায় জ্বালানি দ্বারা সৃষ্ট বহিরাগত গ্যাসীয় চাপকে অর্থাৎ প্লাজমার চাপকে সংযত করা প্রয়োজন।

এই ব্যাপারে দুভাবে অগ্রসর হতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। প্রথমত অধিক উত্তাপে জ্বালানিকে সম্পূর্ণ আয়নিত করে প্লাজমা অবস্থায় আনার পর প্রচণ্ড চৌম্বক ক্ষেত্রের বিশেষ বিন্যাসের সাহায্যে আবদ্ধ করে রাখা হয়। আবদ্ধ অবস্থায় থাকার ফলে জ্বালানি চুল্লীর দেওয়ালের সংস্পর্শে আসতে পারে না। এতে জ্বালানি ঠাণ্ডা হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে না।

দ্বিতীয়ত জ্বালানির ক্ষুদ্র পিলেট বা বড়িকে খুব তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত করে পিলেটকে সংনমিত করে রাখা হয়। ব্যাপারটি এত তাড়াতাড়ি করা হয় যে জ্বালানি প্রসারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ার আগে পাঃ সম্মিলন বিক্রিয়াটি ঘটে যাবে। এভাবে জ্বালানিকে আবদ্ধ করাকে 'inertial' বলে। এ ব্যাপারে জ্বালানি পিলেটকে অতি শক্তিশালী লেসার রশ্মির সাহায্যে উত্তপ্ত করে প্লাজমা অবস্থায় আনা হয় এবং চৌম্বকক্ষেত্রের সাহায্যে আবদ্ধ করে রাখা হয়।

পাঃ সম্মিলন বিক্রিয়ার সাহায্যে শক্তি উৎপাদনের সার্থক রূপায়ণ এখনও সম্ভব হয়নি। তবে এ ব্যাপারে চেষ্টার অন্ত নেই। ঠিক এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না ঠিক কবে আমরা এর থেকে শক্তি উৎপাদন করতে পারবো। যা হোক পাঃ সম্মিলন বিক্রিয়ার যেমন কতকগুলি সুবিধা আছে, এর অসুবিধাও অনেক আছে। যেমন বিভাজন বিক্রিয়ার মত এর থেকেও তেজস্ক্রিয় পদার্থ উৎপাদন হয়। যদিও তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণ ও ভয়াবহতা বিভাজন বিক্রিয়ার থেকে অনেক অনেক

কম। পাঃ সম্মিলন বিক্রিয়ায় চুল্লী থেকে ট্রাইটিয়াম বার হতে পারে। অধিক তাপে ট্রাইটিয়াম চুল্লীর ধাতব মোড়কের মধ্য দিয়ে ব্যাপিত হতে পারে যা বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় জল উৎপাদন করবে এবং এই জল জীবজন্তুর শরীরে অনায়াসে চলে যেতে পারে। যেহেতু ট্রাইটিয়াম তেজস্ক্রিয় পদার্থ, সেহেতু এর থেকে উৎপন্ন জল ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ জীবজগতের পক্ষে মোটেই সুখের ব্যাপার নয়। পাঃ সম্মিলন বিক্রিয়া সফল হলে তাপ পরিবহণের জন্য প্রচুর লিথিয়াম লাগবে। আর এই লিথিয়ামের প্রাচুর্য ভূত্বকে খুব একটা বেশি নয়। পাঃ সম্মিলন বিক্রিয়া ঘটাতে প্রচুর তাপ লাগে এবং ঘটার পর আরো বেশি তাপ উৎপন্ন হয়। ফলে পরিবেশ তাপ দূষণের কবলে নিশ্চয় পড়বে। আর এই বিক্রিয়ার দরুন তেজস্ক্রিয়তার সৃষ্টি হয়, তাই তেজস্ক্রিয়তার জন্য চুল্লীর মেরামত ও সংরক্ষণে খুবই ঝামেলার ব্যাপার।

পৃথিবীতে পাঃ সম্মিলন বিক্রিয়ার একমাত্র উদাহরণ হলো হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ। এই H বোমা ফাটিয়ে উৎপন্ন শক্তি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা হচ্ছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিশাল গহবরকে জল দিয়ে পূর্ণ করে এর মধ্যে H বোমা ফাটিয়ে যে শক্তি উৎপন্ন হবে তা জলকে বাষ্পের পরিণত করবে এবং অধিক চাপে ঐ বাষ্প বার হয়ে আসবে। এখন এই অধিক চাপের বাষ্প দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র সহজেই চালাতে পারা যাবে। এর জন্য প্রতিদিন অন্তত দুটো করে H বোমা ফাটানোর প্রয়োজন হবে। এটাও পরিকল্পনার মধ্যে আছে। বাস্তবে রূপায়িত হয়নি।

ভূ-তাপশক্তি

আজও পৃথিবীর অভ্যন্তরটা খুবই উত্তপ্ত অবস্থায় আছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং উত্তপ্ত লাভা যা মাঝে মাঝে পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে বেড়িয়ে আসে, এটাই এর প্রমাণ। এ ছাড়া উষ্ণ প্রস্রবণ, গেইসার এগুলিকেও প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো যেতে পারে। সৃষ্টিকালে পৃথিবীর শরীরটা ছিল অত্যন্ত উত্তপ্ত। কালক্রমে তাপ বিকিরণের ফলে ভূ-পৃষ্ঠটা ঠাণ্ডা হয়ে গেলেও অভ্যন্তরটা আজও গরম আছে—এই মতবাদটার বিষয়ে গুরুতর মতভেদ থাকলেও, এটা কিন্তু ঠিক যে সৃষ্টির পর থেকে পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে সব তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছিল বা আছে তাদের তেজস্ক্রিয়তার দরুন যে তাপশক্তি বেরিয়েছে এবং এখনও বার হচ্ছে তাই পৃথিবীর অভ্যন্তরটা উত্তপ্ত রেখেছে। কারণ কঠিন শিলাস্তর যা পৃথিবীর অভ্যন্তরকে ঘিরে রেখেছে তার তাপ পরিবহণ ক্ষমতা খুবই কম। তাই তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে উদ্ভূত তাপের প্রায় বেশিরভাগটা অভ্যন্তরে রয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে

দেখিয়েছেন, যে পৃথিবীর কেন্দ্রের তাপমাত্রা প্রায় 4500°C এবং মহাদেশীয় ত্বকের (continental crust) ঠিক গোড়ার তাপমাত্রা প্রায় 1000°C। এটাও দেখা গেছে যে, খনি অভ্যন্তরের প্রতি 1·5 কিলোমিটার গভীরতায় তাপমাত্রা বাড়ে প্রায় 50°C-এর মত।

কাঠ, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামের মত এই ভূ-তাপশক্তির (Geothermal energy) প্রাপ্তিস্থান বা উৎস হলো এই পৃথিবী। প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম এবং কয়লা নামক শক্তির ভাণ্ডারকে জানবার বা চেনবার বহু আগে থেকে মানুষ সন্ধান পেয়েছিল এই ভূ-তাপশক্তির উষ্ণ প্রস্রবণের সাহায্যে। প্রাচীনকালে মানুষ উষ্ণ প্রস্রবণের জলকে কেবল মাত্র স্নানের কাজে ব্যবহার করত। কারণ এই জল নানান রোগ উপশম ও নিরাময় করতে পারে। উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করা বিদেশে ও স্বদেশে আজ সমান জনপ্রিয়। আজও আমাদের দেশের হাজার হাজার মানুষ বক্রেশ্বর, রাজগীর, মানালী, যমুনোত্রী, গৌরীকুণ্ড, বদ্রীনারায়ণ এবং আরো অনেক উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করার জন্য আসেন। আমাদের দেশে উষ্ণ প্রস্রবণকে ঘিরে অনেক তীর্থক্ষেত্রও গড়ে উঠেছে। অনেক উষ্ণ প্রস্রবণের বাষ্প বা জল এতই গরম যে আলু, চাল সেদ্ধ হতে দেখেছি। শীতপ্রধান দেশে উষ্ণ প্রস্রবণ সত্যিই আশীর্বাদস্বরূপ।

কিছুকাল আগে পর্যন্ত এই উষ্ণ প্রস্রবণের জল থেকে বোরিক অ্যাসিড, গন্ধক ও অন্যান্য অনেক রাসায়নিক পদার্থ আহরণ করা হতো। বর্তমানে আর তা করা হয় না। এই জলে পারা এবং ফটকিরি পর্যন্ত পাওয়া যায়। অনেক জায়গায় উষ্ণ প্রস্রবণের জলীয় বাষ্পকে ঠাণ্ডা করে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহারের উল্লেখ আছে। এছাড়া উষ্ণ প্রস্রবণের জলের সাহায্যে শীতকালে বরফ কেটে কাঠের গুড়োর মধ্যে রেখে দেওয়া হতো এবং শীতের শেষে গ্রীষ্মকালে ব্যবহার করা হতো।

সারা পৃথিবীতে পাঁচহাজারের বেশী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সবচেয়ে বেশী আছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। আর আমাদের ভারতে প্রায় দু'শোর মত আছে। সুইডেনে কিন্তু একটাও উষ্ণ প্রস্রবণ নেই। হ্রদের মধ্যেও উষ্ণ প্রস্রবণের সন্ধান মিলেছে। যেমন মানস সরোবরের মধ্যে এইরকম উষ্ণ প্রস্রবণ আছে।

উষ্ণ প্রস্রবণ আদিমকাল থেকে জানা থাকলেও এর থেকে শক্তি আহরণ করা বা রূপান্তর করে বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিণত করার ব্যাপারটা খুব বেশিদিনের কথা নয়। আজ থেকে প্রায় আশী বছর আগে 1904 খ্রীঃ ইটালির লার্ডারেলো (Lardarello) নামক স্থানে প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে একটা পৌনে এক অশ্বশক্তি বিশিষ্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র চালানো হয় এবং এর থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ দিয়ে পাঁচটা বাল্ব জ্বালানো হয়। বর্তমানে 2000 মেগাওয়াটের থেকেও বেশী পরিমাণ বিদ্যুৎ

ভূ-তাপ শক্তির সাহায্যে উৎপাদন করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এই পরিমাণ বাড়বে। এ ছাড়া কৃষি কাজে, জল গরম করতে, শিল্পে বাষ্প সরবরাহ করতে এবং শীতপ্রধান দেশে ঘর গরম রাখতে যে পরিমাণ ভূ-তাপশক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে, তার পরিমাণ প্রায় দশহাজার মেগাওয়াট শক্তির সমান।

তেজস্ক্রিয়তার দরুন পৃথিবীর অভ্যন্তরটা যে পরিমাণ উত্তপ্ত তাতে পাথর বা শিলাখণ্ড গলিত অবস্থায় আছে। এই গলিত শিলাখণ্ডকে বলে ম্যাগমা (magma)। ম্যাগমার উপর কঠিন শিলাস্তরও উত্তপ্ত অবস্থায় আছে। এই কঠিন শিলাস্তর ফেটে গেলে সেখান দিয়ে গলিত লাভা বা ম্যাগমার সংস্পর্শে আসা জল বাষ্পে পরিণত হয়ে উচ্চচাপে প্রবলবেগে পৃথিবী পৃষ্ঠে বার হতে থাকে। গলিত লাভা সব সময় বার হয় না। এটা মাঝে মাঝে বার হয় এবং এই গলিত লাভা দিয়ে উপকারের থেকে অপকারই বেশী হয়। কিন্তু পৃথিবীর বিশেষ কয়েক জায়গায় উচ্চচাপে জলীয় বাষ্প বা উত্তপ্ত জল পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে বার হচ্ছে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় ভূ-তাপশক্তি সন্ধানে প্রথম কূপ খনন করা হয়।



ভূ-তাপশক্তি

যাই হোক ভূ-তাপশক্তিকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(i) শুষ্ক বাষ্প, (ii) আর্দ্র বাষ্প (wet steam), (iii) উত্তপ্ত শিলা এবং (iv) ভূ-প্রেষযুক্ত তলানী বা পলি (geo pressured deposit)।

শুষ্ক ও আর্দ্র বাষ্প বিশিষ্ট ভূ-তাপশক্তিকে জল-তাপ সিস্টেম (hydrothermal system) বলে। কোন কারণে পৃথিবীপৃষ্ঠের জল এই পৃথিবী অভ্যন্তরের শিলাস্তরের ফাটলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সচ্ছিদ্র শিলাস্তর দিয়ে বয়ে আরো কিছুটা গেলে ম্যাগমার ওপরের উত্তপ্ত শিলাস্তরে পেঁছে যায়। এই শিলাস্তরটি ম্যাগমা দ্বারা উত্তপ্ত থাকে। যার সংস্পর্শে জল উত্তপ্ত ও বাষ্পে পরিণত হয় এবং বিভিন্ন পথ বা ফাটল দিয়ে উত্তপ্ত জল বা বাষ্প হিসেবে পুনরায় পৃথিবীপৃষ্ঠে বার হয়ে আসে। এমনটি হতে গেলে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে সচ্ছিদ্র শিলা এবং উত্তপ্ত শিলার স্তর খুব একটা দূরে থাকলে চলবে না। শুষ্ক বাষ্পের তাপমাত্রা খুব বেশী এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে এই বাষ্প খুবই উপযোগী। কারণ এই বাষ্প দ্বারা পরিচালিত যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি কম হয়। উচ্চতাপের বাষ্প সাধারণত সক্রিয় আগ্নেয়-গিরির আশে পাশে, ভূ-কম্পনের দ্বারা বিচ্যুত শিলাস্তরের কাছে নতুন গজান পর্বতশ্রেণী অঞ্চলে বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

90°—150°C তাপমাত্রা বিশিষ্ট জল বা বাষ্পকে আর্দ্র বাষ্প বলে। এটি সাধারণত, বাড়ীঘর গরম ও ঠাণ্ডা রাখতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া শীতপ্রধান অঞ্চলের জলাশয়ে মাছ চাষের জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা বাজায় রাখতে ব্যবহার করা হয়।

ভূ-ত্বকের ফাটল বা গর্ত দিয়ে এই জল বা বাষ্প পৃথিবীপৃষ্ঠে পরিবহণ করে আনে পৃথিবীর অভ্যন্তরের তাপ। কিন্তু এই ফাটল বা গর্ত যথেষ্ট সংখ্যায় এবং উপযুক্ত স্থানে নাও থাকতে পারে। তাই গরম জল বা বাষ্প হিসেবে যথেষ্ট পরিমাণে ভূ-তাপশক্তি পাওয়ার জন্য নলকূপ বসানো হয়। নলকূপ বসানোর উপযুক্ত স্থান নির্বাচন নানা পরীক্ষানিরীক্ষা দ্বারা স্থির করা হয়।

উত্তপ্ত শিলাস্তরে জল প্রায় থাকেই না। এই ভূ-তাপ উৎসটিতে প্রচুর পরিমাণে তাপ সঞ্চিত আছে। এই উৎসটিকে কাজে লাগাতে গেলে ঐ শিলাস্তরে কৃত্রিম উপায়ে জল প্রবেশ করিয়ে তার থেকে বাষ্প বার করে আনা হয় এবং গরম জল বা জলীয় বাষ্পের তাপমাত্রা ও পরিমাণের উপর নির্ভর করবে ঐ জল বা বাষ্প দিয়ে কি করা যাবে।

ভূ-প্রেষযুক্ত তলানী বহুকাল ধরে পলিকাদায় আটকে থাকে। এই তলানী ভূ-গর্ভস্থ জলের থেকে অনেক বেশী গরম অবস্থায় থাকে। এ ছাড়া এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে মিথেন' গ্যাসও দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে, যার দহনেও প্রচুর তাপ পাওয়া যেতে পারে। এই রকম ভূ-প্রেষযুক্ত তলানীর সন্ধান পৃথিবীর নানা জায়গায় পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে কোনটি কয়েক হাজার মাইল লম্বা ও চওড়া প্রায় 250 মাইলের ওপর। গালফকোস্ট, ক্যালিফোর্নিয়া, উটাহ, রাশিয়া, আফ্রিকা, ওকলাহামা ইত্যাদি অঞ্চলে ভূ-প্রেষযুক্ত তলানীর সন্ধান পাওয়া গেছে।

উপযুক্ত অঞ্চলে নলকূপ বসিয়ে ভূ-তাপশক্তিকে পৃথিবীপৃষ্ঠে আনার চেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শুরু হলেও বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকে এর প্রসার নানান দেশে হয়েছে শুধু অল্প খরচে শক্তির জন্য। এই নলকূপগুলির গভীরতা সাধারণত ছয়মাইলের মধ্যে রাখা হয়। কারণ গভীরতা যত বাড়বে নলকূপ বসানোর খরচও তত বাড়বে। ফলে বাণিজ্যিকভাবে শক্তি উৎপাদন খরচও বাড়বে। এ ছাড়া আনুষঙ্গিক আরো অনেক ঝামেলা আছে। প্রথম অবস্থায় শক্তি আহরণের জন্য নলকূপ বসানোর থেকে বোরিক অ্যাসিড, ফটকিরি, পারা (mercury), কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি রাসায়নিক দ্রব্য সংগ্রহ করা হতো। কিন্তু পরে ঐ সব রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনে আর নলকূপ বসানো হতো না। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই শীতপ্রধান দেশে ঘর গরম রাখতে এই ভূ-তাপশক্তি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 1904 খ্রীঃ ইটালির লার্ডারেলোতে ভূ-তাপ বাষ্পের সাহায্যে প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন করার পর পৃথিবীর নানা দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ভূতাপ বাষ্পের সন্ধানে নলকূপ বাসানো আরম্ভ হলো। তবে প্রথমদিকে এই সব নলকূপ থেকে প্রাপ্ত জলীয় বাষ্প ব্যবহারে অনেক বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র অবক্ষয়ের হাত থেকে রেহাই পায়নি। অনেকস্থানে নলকূপ থেকে গরম জল ও জলীয় বাষ্পের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইডও পাওয়া গেল। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড হিমায়ন যন্ত্রে ব্যবহার করা হতো। আমেরিকার গেইসার অঞ্চলে নলকূপ বসিয়ে প্রচুর পরিমাণে শুষ্ক বাষ্প পাওয়া যায়, যা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

ভূ-তাপশক্তির সন্ধান নলকূপ বসাতে গিয়ে 1963 খ্রীষ্টাব্দে স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল অফ ক্যালিফোর্নিয়া (Standard Oil of California) ব্রউলে (Browley) শহরে যে নলকূপটি বসিয়েছিল তাতে উত্তপ্ত লবণজলের (260°C) সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। আরো গভীরে আরো বেশী তাপমাত্রার সন্ধান পাওয়া গেল। এই উৎসটি ব্যাপক ও বিরাট। এটি শক্তির মস্ত ভাণ্ডার যেমন অপর পক্ষে এর থেকে প্রচুর পরিমাণে মিঠে জল পাবারও প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল।

1904 খ্রীঃ প্রথম ইটালির লার্ডারেলোতে ভূ-তাপশক্তি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হলেও, আসলে 1913 খ্রীঃ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে এখান থেকে উৎপাদন হয়ে চলেছে। এই অঞ্চলে শুষ্ক বাষ্প পাওয়া যায়। আজকাল 400 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এখানে উৎপাদিত হচ্ছে। পর্যাপ্ত পরিমাণ বাষ্পের জন্য অনেক নলকূপ বসাতে হয়েছে। ইটালির লার্ডারেলো ছাড়াও আরও পাঁচ দেশে ভূ-তাপ বাষ্পের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়ার গেইসার অঞ্চলে অনেক নলকূপ বসিয়ে উৎপাদিত শুষ্ক বাষ্পের সাহায্যে প্রায় 1000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। এ ছাড়া ক্যালিফোর্নিয়ার ইম্পিরিয়াল ভ্যালিতে অবস্থিত দুটি

শহরে গেইসারের গরম জল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। মেক্সিকোর সিরো প্রিইটো আগ্নেয়গিরির (Cerro Prieto Volcano) কাছে উত্তপ্ত লবণজল থেকে উৎপাদিত আর্দ্রবাষ্পের সাহায্যে টারবাইন চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। লবণজল ব্যবহার করা হয় বলে ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রকে রক্ষার জন্য বিশেষ ধরনের সংকর ধাতু ব্যবহার করা হয়। এই উৎপাদন কেন্দ্রে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে।

নিউজিল্যান্ডের সক্রিয় আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে বিশাল ভূ-তাপশক্তির উৎস আছে। এই অঞ্চলের আদিবাসিরা স্নান, রান্না ও পানের জন্য এখানকার উষ্ণ প্রস্রবণের জল ব্যবহার করত। 1950 খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে এই অঞ্চলেও নলকূপ বসিয়ে ভূ-তাপ বাষ্প উৎপাদন করা হচ্ছে। আর তা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনও করা হচ্ছে। এ ছাড়া রাশিয়া ও জাপানে ভূ-তাপ বাষ্পের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

ভূ-তাপ শক্তিকে (গরমজল বা বাষ্প) অনেক দূরে নিয়ে গেলে অর্থনৈতিক দিক থেকে তেমন লাভজনক হয় না। তাই যে অঞ্চলে এই শক্তির হদিস মেলে সেখানেই এই শক্তিকে অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করে পরিবহণ যোগ্য করে তোলা হয়। সাধারণত এই শক্তি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তা তারের মাধ্যমে বহুদূরে পরিবহণ করা হয়।

ভূ-তাপ বাষ্পের তাপমাত্রা খুব বেশী হলে অর্থাৎ শুষ্ক বাষ্প হলে, এই বাষ্পকে পরিস্রুত করে ধূলোবালি এবং অঘনীভূত গ্যাসীয় যৌগদের পৃথক করে, বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রে পাঠান হয়। এই বাষ্পের একটা প্রধান সুবিধা হলো যে এটা সরাসরি উৎপাদন যন্ত্রে ব্যবহার করা যায় এবং উৎপাদন যন্ত্র থেকে পরিত্যক্ত বাষ্প তখনও যথেষ্ট গরম থাকে বলে এটির থেকে জলকে বাষ্পে পরিণত করে পুনরায় তা বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা চলে বা শীতপ্রধান অঞ্চলে ঘরবাড়ী গরম রাখতে ব্যবহার করা চলে। যে কোন শক্তিকে অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করতে গেলে তার অনেকটা শক্তি নষ্ট হয়। যেমন কয়লা পুড়িয়ে যে তাপ পাওয়া যায় তার মাত্র 30—35% বাষ্প উৎপাদনে খরচ হয়। বাকি তাপ বায়ুমণ্ডলে ব্যাপিত হয়ে নষ্ট হয়। কিন্তু ভূ-তাপ বাষ্পকে সরাসরি ব্যবহারে এই অপচয় হয় না। ভূ-তাপ বাষ্পকে কাজে লাগানোর পর পরিত্যক্ত ঘনীভূত জলকে ভূ-পৃষ্ঠে ফেলে দেওয়া হয় বা তার একটা অংশকে পাইপের সাহায্যে পৃথিবীর অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু ভূ-তাপীয় উত্তপ্ত লবণজল উৎপাদন যন্ত্রে ব্যবহারের পর ভূ-পৃষ্ঠে ফেলে দেওয়ার অনেক অসুবিধে আছে। এর থেকে পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা আছে। বাষ্পে যদি হাইড্রোজেন সালফাইড থাকে তবে ব্যবহারের পূর্বে তাকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে অপসারিত করা প্রয়োজন। লার্ডারেলো অঞ্চলে ভূ-তাপ গরমজলে বোরিক

অ্যাসিড পাওয়া যায়। সুতরাং ভূ-পৃষ্ঠে পরিত্যক্ত জলে বোরিক অ্যাসিড থাকে। তবে তার থেকে কৃষিকাজে বা অন্যপ্রকার কাজে পরিবেশ দূষিত হবার কথা শোনা যায়নি। ভূ-তাপ বাষ্প বা জল ভূপৃষ্ঠের জলের সঙ্গে মেশামেশিটা ঠিক নয়। এতে জল দূষিত হবার বা পানীয় জল অপেয় হবার সম্ভাবনা থাকে। ভূ-তাপ অঞ্চলের পরিত্যক্ত জলীয় বাষ্প বা জলকণা আবহাওয়ার সঙ্গে মিশে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়াতে পারে।

ভূ-তাপ জল বা বাষ্পকে ক্রমাগত পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে বার করে আনলে অভ্যন্তরের অনেকখানি স্থান শূন্য হয়ে গিয়ে ওপরের মাটি ধ্বসে যেতে পারে এবং ভূমিকম্প সৃষ্টি করতে পারে। তাই ব্যবহৃত জলকে পুনরায় অভ্যন্তরে পাঠিয়ে এটির খানিকটা রোধ করা যায়।

এই শক্তি ব্যবহারের অন্যতম প্রধান সুবিধা হলো এই যে, এই উৎস থেকে প্রাপ্ত শক্তির সমপরিমাণ শক্তি কয়লা, পেট্রোলিয়াম বা প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে পেতে হলে পরিবেশ দূষণ অনেক বেশী হবে।

এই উৎস থেকে প্রাপ্ত শক্তিকে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার প্রাথমিক খরচ বিশাল। তবে ব্যয় করে একবার প্ল্যাণ্ট চালু করলে শক্তি উৎপাদনে আপাতত ব্যয় কম। কারণ ভূ-তাপ বাষ্প বা গরমজল বিনা ব্যয়ে পাওয়া যায়, যার পরিবহণ ব্যয় হয় না বললেই চলে এবং তাপ অপচয়ও কম।

যে কোন স্থানে ড্রিল করে নলকূপ বসালেই যে ভূ-তাপশক্তির উৎস কাছেই পাওয়া যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সিসমিক পরীক্ষা, বিমানের সাহায্যে আকাশ পথ থেকে অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে রাত্রিবেলায় বিভিন্ন অঞ্চলের ফটো তোলা হয়। এ দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের উষ্ণ অঞ্চলের হদিশ মেলে। আর তখন সেই অঞ্চলে ড্রিল করে পাইপ বসিয়ে জানা যায় যে সত্যিই উৎসটি আছে কি নেই।

ভূ-তাপশক্তির উৎস সন্ধানে যে সব সময় উচ্চ প্রস্রবণ অঞ্চলেই ড্রিল করতে হবে এমন নয়। আজকাল ড্রিল করা প্রযুক্তিটা এত উন্নত হয়েছে যে পৃথিবীর অভ্যন্তরের তাপকে বার করে কাজে লাগানোর কথা ভাবা হচ্ছে। কারণ পৃথিবী অভ্যন্তরের প্রতি 120 ফুট গভীরতায় তাপমাত্রা বাড়ে 1°C। অতএব দশমাইল যদি ড্রিল করা যায় তবে সেই অঞ্চলের তাপমাত্রা হবে প্রায় 440°C। এখন দুটি এককেন্দ্রিক পাইপ ড্রিল করে বসিয়ে বাইরের নল দিয়ে জল প্রবেশ করালে ঐ জল ভূ-তাপকে বাষ্পাকারে মধ্যের পাইপ দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠে পরিবহণ করে আনবে। পাইপের গভীরতা এবং ব্যাস যত বাড়বে তত বেশী পরিমাণে শক্তি পাওয়া যাবে। এই শক্তির উৎসের ভাণ্ডারটি অফুরন্ত এবং পুনর্নবীভবন যোগ্য। খুব তাড়াতাড়ি প্রচুর পরিমাণে শক্তি আহরণ করলে নলকূপগুলি ঠাণ্ডা হয়ে পড়বে। তাই এমনভাবে শক্তি

আহরণ করতে হবে যাতে তাপমাত্রা মোটামুটি ঠিক থাকে এবং কূপগুলি অনেক দিন ধরে কাজ করতে পারবে।

অনেকসময় পৃথিবী অভ্যন্তরে কঠিন শিলাস্তরকে ড্রিল করার চেয়ে ঐ শিলাস্তরকে ফাটিয়ে এবং জল দিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে ভূ-তাপকে বাষ্প হিসেবে বার করে নেওয়া যেতে পারে। এতে অনেকদিন ধরে প্রচুর পরিমাণে শক্তি পাওয়া যাবে।

জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ছাড়া, জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য যে পরিমাণ জমি লাগে তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ জমির প্রয়োজন হয় ভূ-তাপশক্তিকে আহরণ করতে বা এর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে।

উত্তপ্ত শিলা এবং ভূ-প্রেষযুক্ত পলি থেকে শক্তি আহরণ ব্যাপারটা এখনও পরীক্ষাধীন আছে।

জীবাশ্ম জ্বালানি যত ফুরিয়ে আসবে তত আমাদের এই শক্তির ওপর নির্ভর করতে হবে তাপ আর বিদ্যুতের জন্য।

সৌর শক্তি

সূর্য থেকে প্রতিনিয়ত প্রচুর পরিমাণে শক্তি নির্গত হচ্ছে। যার দু'শো কোটি ভাগের একভাগমাত্র এই পৃথিবীতে আসে। সৌর শক্তি (solar energy) সৌররশ্মি হিসেবে বিকিরিত হয়ে আসছে। সেটা আসলে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বিকিরণ। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঠিক বাইরে বা বায়মুণ্ডলের শেষ পরিধিতে প্রতি বর্গমিটারে 1353 ওয়াট হারে শক্তি সূর্য সরববাহ করে। একে বলে সৌর ধ্রুবক (Solar constant)। সূর্যের বিকিরণ শক্তির মাত্রা মোটামুটি নির্দিষ্ট। কিন্তু পৃথিবীর গতিপথটা উপবৃত্ত বলে সৌর ধ্রুবকের মান 1398 থেকে 1308-এর মধ্যে তারতম্য হয়। এদের গড়মান 1353 ওয়াট প্রতি বর্গমিটারের হলো আসলে সৌর ধ্রুবক। যেটি প্রায় দুই ল্যাংলের (Langley) সমান। এক ল্যাংলে=এক ক্যালরী/সেণ্টিমিটার^2/মিনিট। অর্থাৎ প্রতিমিনিটে প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটার জায়গায় এক ক্যালরী। পৃথিবীর ব্যাসীয় তলের (diametral plane) ক্ষেত্রফল $1{\cdot}2806 \times 10^{14}$ বর্গমিটার। সুতরাং সূর্য প্রায় $1{\cdot}74 \times 10^{17}$ ওয়াট হারে শক্তি পৃথিবীতে সরবরাহ করে।

পৃথিবীতে শক্তির প্রধান জোগানদার হলো সূর্য। প্রায় 99·98%, অবশিষ্ট 0·02% শক্তি জোগান আসে ভূ-তাপ ও মাধ্যাকর্ষণ এবং জোয়ার ভাঁটা থেকে। ভূ-তাপ ও মাধ্যাকর্ষণ থেকে আসে $32{\cdot}3 \times 10^{12}$ ওয়াট, জোয়ার ভাঁটা থেকে 3×10^{12} ওয়াট এবং এই শক্তি তাপ বিকিরণ করে দীর্ঘ তরঙ্গাকারে ভূপৃষ্ঠ থেকে বার হয়ে যায়।

সৌররশ্মি অতি বেগুনী (ultraviolet) রশ্মি, দৃশ্যরশ্মি (visible ray) এবং অবলোহিত রশ্মির মিশ্রণ এবং ঐ সকল রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 0·2—2·6 μm (মাইক্রোমিটার)। তবে এর বেশিরভাগটা হলো 0·3 μm থেকে 1·2 μm-এর মধ্যে থাকে। সৌর রশ্মিতে অতি বেগুনী রশ্মির পরিমাণ 7·82%, দৃশ্য রশ্মি 47·33% এবং অবলোহিত রশ্মি 44·85%।

সৌর ধ্রুবকের সব শক্তিটা পৃথিবী পৃষ্ঠে আসে না। সৌররশ্মি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলে তার একটি অংশ প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে চলে যায়, একটি অংশ বায়ুমণ্ডলে শোষিত হয়, একটি অংশ বায়ুমণ্ডলের দ্বারা বিচ্ছুরিত হয়ে মহাশূন্যে এবং পৃথিবীতে ফিরে আসে, আর একটা অংশ সরাসরি পৃথিবীপৃষ্ঠে আসে এবং তার মধ্যে একটি অংশ আবার প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে চলে আসে। বায়ুমণ্ডল থেকে ব্যাপিত হয়েও পৃথিবীপৃষ্ঠে সৌরশক্তি আসে।

শক্তির এই আয়ব্যয়ের ফলে নীট ফল দাঁড়ায় এই যে 30% বিভিন্নভাবে মহাশূন্যে প্রতিফলিত হয়ে চলে আসছে। বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে অবস্থিত O_3 ওজোন স্তর অতিবেগুনী রশ্মি শোষণ করে এবং বায়ুমণ্ডলে অন্যান্য অণু ও ধূলোবালি এবং মেঘ (জলকণা) সৌরশক্তির একটা অংশ শোষণ করে। এইভাবে বায়ুমণ্ডল প্রায় 19% সৌররশ্মি শোষণ করে। অবশিষ্ট (100% − 30% − 19%) = 51% পৃথিবীপৃষ্ঠে এসে পেঁছায়। অর্থাৎ সৌর ধ্রুবকের প্রায় অর্ধেক পৃথিবীপৃষ্ঠে এসে পেঁছায়। মহাশূন্যে যে 30% সৌররশ্মি প্রতিফলিত হয়ে চলে যাচ্ছে তা ছোট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গাকারে চলে যায়। বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত বিভিন্ন অণুর দ্বারা সৌররশ্মি বিকিরণের ফলে দিনের বেলায় আকাশ নীল লাগে।

বায়ুমণ্ডলে এবং পৃথিবীপৃষ্ঠে সৌররশ্মি প্রায় 70% থাকে। এরমধ্যে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে অবলোহিত বিকিরণ দ্বারা সরাসরি 6% মহাশূন্যে চলে যাচ্ছে। এছাড়াও পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডল দ্বারা বিকিরণ এবং পুনর্বিকিরণের ফলে নীটফল দাড়াচ্ছে ৪% মহাশূন্যে চলে যাওয়া। আর পৃথিবীর সমুদ্র নদীনালার জলকে বাষ্পীভবনের জন্য ব্যয় হয় 23%, যা বেশীর ভাগটা বাষ্পীভবনের জন্য প্রয়োজনীয় লীন তাপ হিসেবে ব্যয় হয়, 17% ঝড়-ঝঞ্ঝা—পরিচলন এবং বিদ্যুৎ চমকাতে ইত্যাদিতে ব্যয় হয়। আর অবশিষ্ট 26% বায়ুমণ্ডল থেকে মহাশূন্যে অন্যান্য প্রক্রিয়ার দ্বারা চলে যাচ্ছে।

বাষ্পীভবনে এবং সেই বাষ্পকে উর্ধ্ব আকাশে তুলতে যে 23% মত সৌর শক্তি খরচ হয় সেই জলীয় বাষ্প শৈত্যের প্রভাবে ঘনীভবনের দ্বারা পুনরায় লীনতাপ বায়ুমণ্ডলে চলে আসে। যার বেশীর ভাগটা বায়ুমণ্ডল দিয়ে মহাশূন্যে বিকিরিত হয়ে চলে যায়।

পৃথিবীর শক্তির এই আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে একটা সমতা আছে। অর্থাৎ পৃথিবী যে পরিমাণ শক্তি গ্রহণ করে ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি নানাভাবে ফিরিয়ে দেয়। এটি নাহলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমাগত বেড়ে চলত না হয় কমে যেতো। কিন্তু পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা মোটামুটি স্থির আছে আজ বহুদিন।

পৃথিবী শক্তির আয় যেমন ব্যয়ও তেমন হলেও, অতি সামান্য পরিমাণ শক্তি পৃথিবীতে দুভাবে আটকে থাকতে পারে। (i) সালোক সংশ্লেষণ দ্বারা, (ii) পর্বত শীর্ষ দেশে অবস্থিত বরফ ও জলের দ্বারা।

পৃথিবী যে পরিমাণ শক্তির জোগান পায় তার মাত্র 0·02% (40×10^{12} ওয়াট) শক্তি সালোক সংশ্লেষণ করতে ব্যয় হয়। জল এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড দিয়ে গাছ সৌরশক্তির সাহায্যে কার্বোহাইড্রেট উৎপন্ন করে শক্তির কিছুটা আবদ্ধ করে রাখে কাঠ, খাদ্য এবং জীবাশ্ম জ্বালানিতে। আর পর্বত শীর্ষে অবস্থিত বরফে স্থিতিশক্তি থাকে। বৃষ্টির জল পাহাড় পর্বত বেয়ে গড়িয়ে এলে তাতে স্থিতি গতিশক্তিতে পরিণত হয়। যা থেকে আমরা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি।

জল কার্বন ডাই-অক্সাইড অবলোহিত রশ্মি শোষণ করতে পারে। এর ফলে জমি, বায়ুমণ্ডল ও সমুদ্রজল উত্তপ্ত হয়। অর্থাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ যত বাড়বে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা তত বাড়বে। কাঠ, জীবাশ্ম জ্বালানি ইত্যাদি যত পোড়ানো হচ্ছে এবং বনভূমি যেভাবে সাবাড় করা হচ্ছে তাতে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাড়ছে। ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়বে, বৃষ্টিপাত কমছে, ভূমিক্ষয় বাড়বে, মরুভূমির আগ্রাসন বাড়বে। ফলে সমূহ বিপদ। এ ছাড়া মেরু অঞ্চলে চিরতুষার রাজ্যের বিশাল পরিমাণ বরফের একাংশ গলে যাবে। ফলে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্লাবনের আশঙ্কা থাকবে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের একটি ভালো পরিমাণ অবশ্য সমুদ্র জলে দ্রবীভূত হয়ে যায়। তবে সমুদ্র জলেরও কার্বন ডাই-অক্সাইড নেবার একটা ক্ষমতা আছে।

পচনের ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহের সঞ্চিত শক্তির একটি অংশ দীর্ঘ তরঙ্গাকারের বিকিরণের দ্বারা মহাশূন্যে বিলীন হচ্ছে। তবে এর পরিমাণ খুবই নগণ্য।

সৌরশক্তি ব্যবহারের ইতিহাস

সৌরশক্তি ব্যবহার অতি সুপ্রাচীন। মানুষ কৃষিজাত পণ্য শুকানোর জন্য এবং শীতের দিনে শরীরকে উত্তপ্ত করতে সৌরশক্তি সরাসরি ব্যবহার করতো এবং এর ব্যবহার আজও চলছে। শীতের সকালে একটু রোদের জন্য আমরা আজও সমান

ব্যাকুল হই। জামা কাপড় এবং অন্যান্য নানা জিনিস শুকানোর জন্য রোদের ব্যবহার এখনও সমানে চলেছে। সৌরশক্তির সাহায্যে প্রথম রাসায়নিক পরীক্ষা করেন 1774 খ্রীষ্টাব্দে যোসেফ প্রীস্টলে। তিনি সূর্য রশ্মিকে লেন্সের সাহায্যে ঘনীকরণের দ্বারা মারকিউরিক অক্সাইডকে (HgO) মারকারী ও অক্সিজেনে বিয়োজিত করেন। 1872 খ্রীষ্টাব্দে উত্তর চিলির মরুভূমি অঞ্চলে রোদের সাহায্যে সমুদ্র জলকে পাতিত করে মিঠে পানীয় জল প্রস্তুত করা হতো। এইভাবে দৈনিক 6000 গ্যালন জল প্রস্তুত হতো। 1878 খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে রোদের সাহায্যে বাষ্প উৎপন্ন করে ইঞ্জিন চালিয়ে ছাপাখানা চালানো হয়েছিল।

এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং পরে মিশরে সৌরশক্তির সাহায্যে নানান ইঞ্জিন চালানো হয়েছিল। 1930 থেকে 1960 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অনেক সৌর চালিত বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানি চালিত অন্যান্য ইঞ্জিনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেনি। বর্তমানে জীবাশ্ম জ্বালানির দাম বাড়ার ফলে এবং অপ্রতুলতার জন্য আবার সৌরশক্তি চালিত ইঞ্জিনের দিকে দৃষ্টি ফেরানোর কথা ভাবা হচ্ছে।

সৌরশক্তি ব্যবহারে সুবিধা অসুবিধা

সৌরশক্তিকে সরাসরি ব্যবহারে অনেক সুবিধা আছে। যেমন সৌরশক্তি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এটি পুনর্নবীভবনযোগ্য শক্তি এবং নিখরচায় পাওয়া যায়। যদিও সৌরশক্তিকে অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করতে এবং সংরক্ষণে খরচ প্রচুর। স্থানীয়ভাবে ব্যবহারে পরিবহণ খরচ লাগে না। এই শক্তি ব্যবহারে পরিবেশ দূষণ একেবারেই হয় না।

সৌরশক্তির ব্যবহারের প্রধান অসুবিধা হলো এই যে, এই শক্তি অনেকখানি জায়গায় ছড়িয়ে বা বিস্তৃত হয়ে থাকে বলে কাজে লাগানোর অনেক অসুবিধা। প্রতিদিন 10 থেকে 12 ঘণ্টার বেশি সূর্যরশ্মি পাওয়া সম্ভব নয়। সৌরশক্তির জোগান একটা অনিয়মিত ব্যাপার। কেবলমাত্র মেঘহীন দিনে সৌরশক্তি সর্বাধিক পাওয়া যায়। পৃথিবীর সর্বত্র এবং সকল ঋতুতে সৌর শক্তির প্রচুর হেরফের হয়। যেমন নিরক্ষীয় অঞ্চলে সর্বাধিক এবং অক্ষাংশ বাড়ার সঙ্গে ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে মেরু অঞ্চলে সর্বনিম্ন সৌরশক্তি পাওয়া যায় এবং গ্রীষ্মকালে সর্বাধিক এবং শীতকালে সর্বনিম্ন হয়। যে কোন ঋতুতে মেঘের আনাগোনার ওপরও এটা নির্ভর করে। অবশ্য মরু অঞ্চলে সৌরশক্তি বছরে গড়ে সর্বাধিক পাওয়া যায় এবং ঐ মরুভূমি যদি নিরক্ষীয় অঞ্চলে হয় তবে তো কথাই নেই। স্বভাবত মরুভূমি অঞ্চলে লোকবসতি

কম। অতএব শক্তির চাহিদাও কম। এই অঞ্চলে সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে অবশ্য বহুদূরে নিয়ে যাওয়া যায়।

এখন 400 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সৌর শক্তিকে সংগ্রহ করতে কি আয়তনের জমি দরকার?

মনে করি ভারতে প্রতি বর্গমিটার জায়গায় বছরে গড় 400 ওয়াট শক্তি সূর্য জোগান দেয়। তবে 400 মেগাওয়াট সৌরশক্তি সংগ্রহ করতে জমির আয়তন

$$\text{হবে} = \frac{400 \times 10^6 \text{ ওয়াট}}{400 \text{ ওয়াট/মিটার}^2} = 10^6 \text{ মিটার}^2 \text{।}$$

বা এক বর্গ কিলোমিটার

এ ক্ষেত্রে সৌরশক্তি সংগ্রহে এবং তার থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে দক্ষতা 100% ধরা হয়েছে। সংগ্রহে এবং উৎপাদনে ঐ দক্ষতা কখনই সম্ভব নয়। সুতরাং কার্যক্ষেত্রে ঐ আয়তন জমির থেকে অনেকগুণ বেশীই জমি লাগবে। তাও আবার দিনের মধ্যে 10—12 ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারবে।

সৌ র শ ক্তি সং গ্রা হ ক

প্রচুর পরিমাণে সৌরশক্তি এই পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রতিদিন আসা সত্ত্বেও এই শক্তি এমনভাবে ভূ-পৃষ্ঠে ও বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে যে তাকে আহরণ করে কার্যকরী শক্তিতে রূপান্তর হলো আসল প্রযুক্তি।

সৌরশক্তি সংগ্রাহক তিন রকম হতে পারে। (i) তাপীয় সংগ্রাহক, (ii) ফটো ভোল্টাইক সংগ্রাহক, (iii) বায়োলজিক্যাল সংগ্রাহক। সৌর কোষ বা ব্যাটারীর (যাকে ফটো ভোল্টাইক সংগ্রাহক বলে) সাহায্যে সৌরশক্তিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। মহাকাশ যানে এই ব্যাটারী ব্যবহার করা হয়। বায়োলজিক্যাল সংগ্রাহক বলতে আমরা বুঝবো সালোক সংশ্লেষণ। সৌরশক্তির মধ্যে অবশ্য সমুদ্র স্রোত, সমুদ্র স্তরের তাপীয় নতি (thermal grudient), জলবিদ্যুৎ বা জল-শক্তি ধরা হচ্ছে না। যদিও এগুলির প্রত্যেকটির শক্তির উৎস হলো সৌরশক্তি।

তা পী য় সং গ্রা হ ক

সৌররশ্মি হলো ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বিকিরণ। ভূ-পৃষ্ঠে সৌর বিকিরণ যা আসে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 0·2 থেকে 3 μm-এর মধ্যে থাকে। সৌর বিকিরণকে বিভিন্ন কলাকৌশলের দ্বারা শোষণ করে তাপশক্তিতে পরিণত করা যায়। এইভাবে সৌর বিকিরণের প্রায় 90 থেকে 99% অংশ তাপশক্তিতে পরিণত করা যায় এবং

ফলে মরুভূমির আগ্রাসন রোধ করা যাবে। বন্যপ্রাণী ও পাখীর বংশবিস্তার ও সংরক্ষণ হবে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা পাবে। বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমবে এবং অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়বে। প্রাণীকূলের পক্ষে যা খুবই মঙ্গল।

কাঠের আর এক সুবিধা হলো এই যে কাঠের অন্তর্ধূম পাতনে প্রাপ্ত বিভিন্ন পদার্থ শক্তি উৎপাদনে এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয়। কাঠের অন্তর্ধূম পাতনে 'কাষ্ঠ গ্যাস' (wood gas), কাঠ কয়লা এবং পাইরোলিগনিয়াস অ্যাসিড (pyroligneous acid) নামক তরল পদার্থ উৎপাদন করা যায়। কাঠ কয়লা ঘর গরম করতে এবং অন্যান্য অনেক কাজে ব্যবহৃত হয়। পাইরোলিগনিয়াস অ্যাসিড থেকে মিথানল অ্যাসিটোন উৎপাদন করা যায়। আগে এইভাবে মিথানল ও অ্যাসিটোন উৎপাদন করা হতো। মিথানলকে তরল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কাষ্ঠ গ্যাস দিয়ে বিশেষ ধরনের অটোমোবাইল চালানো যেতে পারে।

তাই কাঠের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিশেষ বিশেষ সঙ্কর জাতীয় গাছের চাষ বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে সুবাবল (কুবাবল) নামে এক বিশেষ গাছ লাগানো বেড়ে যাচ্ছে। এটি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। পাতা গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায় এবং কাঠ জ্বালানি বা কাগজের জন্য ব্যবহার করা চলে।

এই ধরনের গাছের চাষ নিবিড়ভাবে করে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে ব্যবহার করা চলে। এমন কি করাতকলের কাঠের গুঁড়ো দিয়েও বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা চলে। শক্তি উৎপাদনে কাঠের ব্যবহারের প্রধান সুবিধা হলো কাঠের ছাইয়ের পরিমাণ কম হয় এবং কয়লার ছাই ও পারমাণবিক জ্বালানির অবশেষ হ্যান্ডলিং করার থেকে অনেক সহজ এবং এটি কোন সমস্যাই নয়। বরং কাঠের ছাই ভালো সার। জ্বালানি হিসেবে কাঠের ব্যবহারের প্রধান অসুবিধা হলো ধোঁয়া এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড, যা বায়ু দূষিত হবার অন্যতম প্রধান কারণ।

সজীব শক্তি

মানুষ ও জীবজন্তুর পেশীও শক্তির একটি উৎস। এটি পুনর্নবীভবনযোগ্য এবং অহ্রাসযোগ্য উৎস। কিন্তু উৎপাদ (out put) অন্যান্য শক্তির উৎস থেকে কম। মানুষের পেশীর শক্তি বলতে বুঝবো মানুষের শক্তি। তেমনি জীবজন্তুর পেশীর শক্তি মানে জীবজন্তুর শক্তি।

এটা দেখা গেছে যে বারোটা লোকের সম্মিলিত কাজের পরিমাণ হলো এক অশ্বশক্তির সমান বা একটা লোক কমপক্ষে একনাগাড়ে বারো ঘণ্টা খাটলে তার কাজের পরিমাণ হবে এক অশ্বশক্তির সমান। সাধারণত একটা মানুষের ক্ষমতা 0·04 থেকে 0·08 অশ্বশক্তির সমান। তাও আবার কিছু সময়ের জন্য। একনাগাড়ে কাজ করে গেলে মানুষ বা জীবজন্তুর কর্মদক্ষতা ধীরে ধীরে কমে আসে। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা 470 কোটি বা তার বেশী। তাই এদের সম্মিলিত কাজ করার ক্ষমতা বিশাল। অবশ্য সবাই যদি করে।

কিছুকাল আগে পর্যন্ত মানুষের 'বল বল বাহু বল' ছিল অন্যতম প্রধান ভরসা। এই বাহুবল (যা মানুষের ক্ষমতা বলে আমরা ধরি) যত কম হোক না কেন, এটি না হলে মানুষ কোন শক্তির উৎসকেই কাজে লাগাতে পারতো না। এর সঙ্গে মগজের শক্তিও চলে আসে, সেটাকে আমরা মানুষের শক্তি বলেই ধরবো। মানুষ তার পেশীর শক্তিকে সহজে অনায়াসে এবং যে কোন সময় কাজে লাগাতে পারে। এর জন্য কারিগরী জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। এটির ব্যবহারে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের কোন ক্ষতি হয় না বা পরিবেশ দূষিত হয় না। কিন্তু এটির প্রধান অসুবিধা হলো এই যে, এর কর্মক্ষমতা খুবই কম। মানুষের শক্তিকে কাজে লাগানো খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার। কারণ পেশীর শক্তিকে কাজে লাগাতে গেলে পেশীতে শক্তির জোগান দেওয়ার জন্য চাই উপযুক্ত খাদ্য—যার জন্য দাম বেশ বেশীই দিতে হয়।

মানুষ নিজের পেশীর শক্তির ওপর তেমন ভরসা না করে অতি প্রাচীনকাল থেকে অন্যান্য জীবজন্তুর দৈহিক শক্তির ওপর বিশেষ নির্ভর করতো এবং আজও করে আসছে। কৃষিকাজে, পরিবহণে, জলসেচ ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে আজও জীবজন্তুকে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এদের থেকে প্রাপ্ত কাজের সমপরিমাণ শক্তির অংকটা নেহাৎ কম নয়।

আমাদের দেশে জমি চষার জন্য গরু, মোষ, উট ইত্যাদি যত ব্যবহার আজও করা হচ্ছে তার তুলনায় ট্র্যাক্টর, পাওয়ার টিলার নিতান্তই নগণ্য। এখনও কৃষি-পণ্য পরিবহণে জীবজন্তুকে বিশেষ করে ব্যবহার করা হয়। যার ফলে গরুর গাড়ীর অনেক উন্নতি সাধন করা হয়েছে। এখনও আমরা আখ মারাইয়ের জন্য এবং ঘানি থেকে তেল নিষ্কাশনে জীবজন্তুকে কাজে লাগাই। জলসেচের কাজেও জীবজন্তুকে ব্যবহার করি। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে পরিবহণ প্রধানত গাধা ঘোড়া ইত্যাদি জন্তুর সাহায্যে করা হয়। এ চিত্র পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই চোখে পড়ে। তুন্দ্রাঞ্চলে পরিবহণের কাজে কুকুর, এমনকি বল্গা হরিণকেও কাজে লাগানো হয়।

যার ফলে 20°C থেকে প্রায় 3300°C পর্যন্ত তোলা যায়। পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা এবং সংগ্রাহকের তাপমাত্রার প্রভেদের ওপর শোষণের দক্ষতা নির্ভর করে। প্রভেদ যত বাড়বে দক্ষতা তত কমবে। তাপীয় সংগ্রাহকের দ্বারা লবণাক্ত সমুদ্র জলকে লবণমুক্ত করে পানীয় জলে পরিণত করা হয়। রান্না করতে, শীত প্রধান দেশে ঘর দোর গরম রাখতে এবং জল গরম করতে এই তাপশক্তি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া হিমায়নকারী যন্ত্রে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনেও এই তাপশক্তিকে ব্যবহার করা যায় যদি তাপমাত্রার প্রভেদ যথেষ্ট থাকে। এই কাজে ফোকাসিত এবং অফোকাসিত সংগ্রাহক ব্যবহার করা হয়। লেন্স, আয়না বা বিশেষ ধরনের ফিল্মের সাহায্যে ফোকাসিত সংগ্রাহকের দ্বারা সৌরশক্তিকে ঘনীভূত করে ব্যবহার করা হয়।

সূর্যরশ্মি দিয়ে সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে পানীয় জলে পরিণত করা বোধ হয় সৌরশক্তিতে কাজে লাগানর প্রাচীনতম প্রযুক্তি।

সাধারণত বড় চৌবাচ্চার আকারে কোন স্থানে সমুদ্রের লবণাক্ত জল নিয়ে ঐ চৌবাচ্চার ওপরটা স্বচ্ছ কাচ বা বিশেষ ধরনের স্বচ্ছ প্লাস্টিক আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। চৌবাচ্চার মধ্যের দেওয়াল কালো রং করে রাখা হয় এবং ওপরের স্বচ্ছ আবরণটি ঢালু করে রাখা হয়। ঐ আবরণের মধ্য দিয়ে সূর্যরশ্মি (ছোট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ) সহজেই প্রবেশ করতে পারে কিন্তু ঐ আবরণ দীর্ঘ দৈর্ঘ্যের আলোর তরঙ্গকে বার হতে দেয় না। অর্থাৎ ঐ আবরণটি ছোট দৈর্ঘ্যের আলোর তরঙ্গের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ হলেও দীর্ঘ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের ক্ষেত্রে অস্বচ্ছ। ফলে সৌরশক্তি স্থানবদ্ধ হয়ে জলকে বাষ্পীভূত করে। ঐ বাষ্প আবরণের তলায় ঘনীভূত হয়ে গড়িয়ে চলে এসে বিশেষ জায়গায় সঞ্চিত হয়। এই জল সম্পূর্ণ লবণমুক্ত এবং পাতিত। পানের পক্ষে ঐ জল খুবই ভালো। এইভাবে সৌরশক্তির প্রায় 90% কাজে লাগানো যায়। এতে একদিকে যেমন পানীয় জল পাওয়া যায় অপর পক্ষে বিভিন্ন ধরনের লবণের মিশ্রণ পাওয়া যায়। যার মধ্যে বেশীর ভাগটা খাদ্য লবণ।

গ্রীস, অস্ট্রেলীয়া দেশে এইভাবে সৌরশক্তির সাহায্যে পানীয় জল প্রস্তুত করা হয়।

সূর্যরশ্মি সাহায্যে খোলা জায়গায় সমুদ্র জলকে বাষ্পীভূত করে আমাদের দেশে খাদ্য লবণ প্রস্তুত করা হয়।

এই ব্যাপারে প্রধান অসুবিধা হলো এই যে কেবলমাত্র মেঘহীন দিনে (দিনের বেলায়) সম্ভব এবং পাতিত জল খুব আস্তে আস্তে সংগৃহীত হয়। প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুতিতে প্রচুর জায়গার দরকার। তবে খরচ করে একবার বসাতে পারলে কোন জ্বালানি খরচ নেই এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ খুবই কম। আর পরিবেশ দূষণের কোন সমস্যাই নেই।

শীতপ্রধান দেশে গৃহস্থের প্রয়োজনে গরম জল সূর্যরশ্মির সাহায্যে করা হয়। একাজে সাধারণত কালো রং করা ইস্পাত বা অ্যালুমিনিয়াম বা তামার তৈরী পাত ব্যবহার করা হয়, যা তাপ সংগ্রাহক হিসেবে কাজ করে। ঐ সংগ্রাহকের তলায় ধাতব পাইপ বিশেষ কায়দায় আটকান থাকে। আর ঐ সংগ্রাহকের ওপরে স্বচ্ছ কাচ বা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে আর নিচে অপরিবাহী বস্তু দিয়ে আটকান থাকে। যাতে বিকিরণের সাহায্যে তাপ অপচয় কম হয়। ঐ পাইপের মধ্য দিয়ে কোন জলাধার থেকে ধীরে ধীরে জল প্রবাহিত করা হয়। দিনের বেলায় ঐ স্বচ্ছ আবরণ দিয়ে সূর্যরশ্মি প্রবেশ করে ঐ ধাতব পাতকে উত্তপ্ত করে। ঐ আবরণ সৌর শক্তিকে আবদ্ধ করে রাখে। ঐ পাতগুলি উত্তপ্ত হলে পাইপগুলিও উত্তপ্ত হবে, ফলে জলও উত্তপ্ত হবে। এই রকম সংগ্রাহকের সাহায্যে গ্রীষ্মকালে ৪0°C এবং শীতকালের 50°C পর্যন্ত গরম করা যায়। ইজরাইল, জাপান, অস্ট্রেলিয়ায় এইভাবে জল গরম করা হয়।

শীতপ্রধান দেশের ঘরের ছাদকে সংগ্রাহক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এতে একদিকে যেমন গরম জলের জোগান দেওয়া যায়, অপর পক্ষে ঘর গরম রাখাও যায়। এইভাবে উত্তপ্ত গরম জলকে সঞ্চিত করে রেখে রাতের বেলায় ঘর গরম রাখতে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এই ব্যবস্থা কেবলমাত্র মেঘহীন দিনেই সম্ভব। তাই মেঘাচ্ছন্ন দিনের জন্য উত্তপ্ত করার অন্য ব্যবস্থাও রাখতে হয়।

সূর্যরশ্মির সাহায্যে জল বা ঘর গরম রাখতে হলে ঘরবাড়ীর নক্সা এমন হওয়া দরকার যে সর্বাধিক সূর্যরশ্মি বাড়ীটি যেন পায়। সূর্যরশ্মি সংগ্রাহকের থেকে পাইপ দিয়ে জলের সাহায্যে তাপ পরিবহণ করে যেমন ঘর গরম রাখা যায়, তেমনি বাতাসের সাহায্যেও তাপ পরিবহণ করা যায়।

সৌরশক্তির সাহায্যে রান্না

এই কাজে সৌর চুল্লী ব্যবহার করা হয়। এই চুল্লীতে সূর্যরশ্মিকে ঘনীভূত করে ব্যবহার করা হয়। সৌরচুল্লীটি আসলে তাপ অপরিবাহী বস্তু দিয়ে তৈরী বাক্স। যার মধ্যেটা কালো রং করা থাকে এবং এক বা একাধিক স্বচ্ছ আবরণ দিয়ে মুখটা ঢাকা থাকে। এতে অনেকগুলি ধাতব প্রতিফলক থাকে। মধ্যাহ্নের সূর্যের দিকে মুখ করে সৌর চুল্লীটি বসান থাকে। সূর্যরশ্মি প্রতিফলক থেকে প্রতিফলিত হয়ে স্বচ্ছ কাচের আবরণের মধ্য দিয়ে এসে ঐ বাক্সের মধ্য ঘনীভূত হয়ে আসে। এতে চুল্লীর মধ্যে সহজে 170°—200°C পর্যন্ত তোলা যায়। বিশেষ ধরনের প্রতিফলকের সাহায্যে আরো অধিক তাপমাত্রা তোলা যায়। সেদ্ধ বা বেকিং করতে এই চুল্লী ব্যবহার করা হয়। ধাতব পাত্রে রান্নার বস্তুকে নিয়ে ঐ চুল্লীর অভ্যন্তরে

বসিয়ে রাখা হয় এবং ঐ ধাতব পাত্রের বাইরের দিকে কালো রং করা থাকে। যাতে সর্বাধিক সৌরশক্তি ঐ পাত্রগুলি শোষণ করতে পারে। সৌর চুল্লীর সাহায্যে কেবলমাত্র দিনের বেলায় রান্না চলে।

সমতল প্লেট সংগ্রাহক

এই ধরনের সংগ্রাহকগুলির প্লেট অ্যালুমিনিয়াম, স্টিল বা তামার পাত দিয়ে প্রস্তুত এবং এগুলি কালো রং করা থাকে। এগুলি এক বা একাধিক স্বচ্ছ কাচের দ্বারা আবৃত থাকে। ফলে 'গ্রীনহাউস প্রভাব' (green house effect)-এর দরুন ঐ আবৃত অংশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। এই সংগ্রাহকগুলিকে সূর্যরশ্মির সঙ্গে লম্বভাবে রাখা হয়। এতে ব্যাপিত সূর্যালোক এবং বিকিরণ শক্তি শোষিত হয়। ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। যা দিয়ে জল বা বাতাসকে 150°C—300°C পর্যন্ত উত্তপ্ত করা যায়। সাধারণত 50°C—100°C পর্যন্ত তাপমাত্রা তোলা হয়।

সমতল প্লেট সংগ্রাহকের তিন উপায়ে উন্নতি করা যায়—(i) অনেকগুলি কাচের আবরণ ব্যবহার করে, (ii) সংগ্রাহক থেকে প্রতিফলনের হার কমিয়ে এবং (iii) সংগ্রাহকের শোষণ ক্ষমতা বাড়িয়ে।

ফোকাসিত সংগ্রাহক

এই ধরনের সংগ্রাহকের সাহায্যে তাপমাত্রা অনেকগুণ বাড়ানো যায়। সমতল প্লেট সংগ্রাহকের বহু আগে ফোকাসিত সংগ্রাহক ব্যবহৃত হয়েছে। এই ফোকাসিত সংগ্রাহকের সাহায্যে প্যারিসে 1878 খ্রীষ্টাব্দে বাষ্প উৎপাদন করে বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালিয়ে ছাপাখানা চালান হয়।

ফোকাসিত সংগ্রাহকগুলি সূর্যের আহ্নিক গতির সঙ্গে ঘোরাতে হয়। অর্থাৎ প্রতি চারমিনিটে এক ডিগ্রি। মেঘের দ্বারা অনাবৃত সরাসরি সূর্যরশ্মিকে লেন্স বা আয়নার সাহায্যে ঘনীভূত করে কাজে লাগানো হয়। আলোকীয় ঘনীকরণে সৌরশক্তিকে একটি বিন্দু বা রেখায় ফোকাস করা হয়। এতে সৌরশক্তির একটি অংশ পরিবহণের (conduction) দ্বারা নষ্ট হয়। এই অসুবিধে দূর করতে ঐ সংগ্রাহকের চারপাশে বায়ু শূন্য করে রেখে পরিবহণের দরুন শক্তির অপচয় রোধ করা যায়।

ফোকাসিত সংগ্রাহককে সূর্যের আহ্নিকগতির সঙ্গে ঘুরিয়ে সূর্যরশ্মিকে একটি টাওয়ারের মাথায় ফোকাস করা হয়, সেখানে শোষক বা অবশোষক (absorber)

আছে। এই কাজে Heliostat ব্যবহার করা হয়। এইভাবে অনেকগুলি heliostat ব্যবহারে সূর্যরশ্মি থেকে প্রায় 1500°C তোলা সম্ভব। যা দিয়ে 100 মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালানো সম্ভব। Heliostat-এর সংখ্যা যত বাড়বে তত বেশি জমির প্রয়োজন।

সমতল প্লেট বা ফোকাসিত সংগ্রাহকের প্রধান অসুবিধা হলো এদের প্রকাণ্ড আকার। সুতরাং ঝড় বাতাসের থেকে রক্ষা করতে খুবই মজবুত করে তৈরি করতে হয়। এছাড়া লেন্স আয়না বা প্লেটগুলিকে ধুলোর হাত থেকে রক্ষা করা দরকার। কারণ সংগ্রাহকের ওপর ধুলো জমার সঙ্গে এদের কার্যক্ষমতা নির্ভর করছে।

শক্তি সঞ্চয়

সৌরশক্তি কেবলমাত্র মেঘহীন আকাশে দিনের বেলায় পাওয়া যায়। সুতরাং সৌরশক্তির জোগান কেবলমাত্র দিনের বেলায় পাওয়া যায়। তাও আবার অনিয়মিত। তাই সৌরশক্তি উৎপাদন যন্ত্রের জন্য শক্তি সঞ্চয় করার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা দরকার। আর সৌর তাপীয় শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের প্রধান ব্যয় হলো এই সঞ্চয় ব্যবস্থা করা। শক্তি উৎপাদন যন্ত্রের টারবাইন বাষ্প তাপের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। বাষ্প তাপের পার্থক্যের জন্য টারবাইনের উৎপাদন বিশেষভাবে হেরফের হয়। এই অসুবিধা দূর করতে সব সময় সৌরশক্তি সঞ্চয় তন্ত্র মাধ্যম ব্যবহার করা হয়। এতে নির্দিষ্ট তাপ সরবরাহ সম্ভব। অতএব যেকোন সৌর তাপীয় শক্তি উৎপাদন যন্ত্রে সঞ্চয় তন্ত্র থাকা দরকার। সঞ্চয় মাধ্যমের নিম্নলিখিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন (i) কম খরচ, (ii) অধিক তাপধারণ ক্ষমতা, (iii) অধিক তাপে কার্যক্ষমতা বিশিষ্ট, (iv) অক্ষয়কর ধর্ম, (v) নিরাপত্তা।

জলীয় বাষ্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাধারণত পাথর কুচি ব্যবহার করা হয়। অধিকতাপ কার্যক্ষমতার জন্য লবণজল খুবই উপযোগী হলেও খরচ বেশী পড়ে। এবং লবণজল ব্যবহারে সঞ্চয় যন্ত্রে ও পাইপে মরচে পড়ে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় এই কাজে মোম বা হাইপো (hypo)-র ন্যায় কম গলানাঙ্কের দ্রব্যও ব্যবহার করা যায়।

ফটোভোল্টাইক সংগ্রাহক

আলো বা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বিকিরণকে সেমিকনডাকটরের সাহায্যে শোষণ করে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরকে ফটোভোল্টাইক প্রক্রিয়া (photo voltaic effect)

বলে। সৌর কোষ এবং এক্সপোজার মিটার হলো ফটোভোল্টাইক সংগ্রাহকের উদাহরণ।

তাপগতি চক্র ছাড়াই সৌরকোষ সূর্যরশ্মি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। ফটোভোল্টাইক কোষে ব্যবহৃত বিশেষ পদার্থ সচল (mobile) আধান বাহক (charge carrier) সৃষ্টি করতে পারে আলোক শক্তিকে শোষণ করে। এতে যেখানে এই আধানবাহক সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে একটি বিভব প্রভেদেরও সৃষ্টি হয়। এই কাজে সেমিকনডাক্টর (semi conductor) ব্যবহার করা হয়। সেমিকনডাক্টর হিসেবে সিলিকন (Si), গ্যালিয়াম আর্সেনাইড (GaAs), ক্যাডমিয়াম সালফাইড (CdS), কপার সালফাইড (Cu_2S) ব্যবহার করা হয়। একক সিলিকন ফটো-ভোল্টাইক কোষ 0·5 ভোল্ট উৎপন্ন করতে পারে। ফলে উচ্চ বিভব প্রভেদ সৃষ্টির জন্য অনেক কোষকে শ্রেণীসমবায়ে যুক্ত করতে হয়। সৌর কোষের সাহায্যে D.C. উৎপন্ন হয়, যাকে ইনভারটারের সাহায্যে A.C.-তে রূপান্তরিত করা হয়।

একক সিলিকন কেলাস দিয়ে সিলিকন সৌর কোষ প্রস্তুত করা হয়। যা বেশ দামী। তাই অন্যান্য পদার্থ ব্যবহারে খরচ কমানোর চেষ্টা চলছে, আর সঙ্গে সঙ্গে কার্যক্ষমতা বাড়াবার চেষ্টাও হচ্ছে। ক্যাডমিয়াম সালফাইড ব্যবহারে আপতিত রশ্মির মাত্র 6% বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সিলিকন কোষের কার্যক্ষমতা 11%, গ্যালিয়াম আর্সেনাইডের 18% এবং অ্যালুমিনিয়াম অ্যাণ্টিমোনাইডের রূপান্তর ক্ষমতা 20%।

সৌর কোষ থেকে প্রাপ্ত শক্তি ব্যবহারে সংরক্ষণ ব্যবস্থার এবং ইনভারটারের প্রয়োজন। মহাকাশে প্রেরিত বিভিন্ন যানে শক্তি সরবরাহ করা হয়ে থাকে সৌর কোষ দিয়েই।

সা লো ক সং শ্লে ষ ণ

গাছের পাতায় এবং বিভিন্ন অংশে অবস্থিত ক্লোরোফিল সূর্যালোকের সাহায্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের বিক্রিয়ায় কার্বোহাইড্রেট উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়াকে সালোক সংশ্লেষণ বলে। সালোক সংশ্লেষণের দ্বারা গাছ সৌর শক্তির একটি অংশকে তার শরীরে আবদ্ধ করে রাখে। গাছের ছাল, কাঠ, পাতা ও শেকড় প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের ব্যবহৃত শক্তির একটি অন্যতম প্রধান উৎস। এছাড়া গাছজাত বিভিন্ন পদার্থ এবং ঐ সকল পদার্থ থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন বস্তু নানান কাজে শক্তির বিকল্প উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয় বা জ্বালানির সাশ্রয় করে। যেমন কাঠ, কয়লা। রাবার গাছ থেকে পাওয়া রাবার লেটেক্স হলো হাইড্রোকার্বনের একটি উৎস, যা দিয়ে রাবার জাত বিভিন্ন জিনিস প্রস্তুত করা

যায়। এতে পেট্রোলিয়ামের সাশ্রয় হয়। ফলে জ্বালানি সংরক্ষণ হচ্ছে। এছাড়া আখ থেকে উৎপন্ন চিটে গুড় থেকে ইথাইল কোহল প্রস্তুত করা হয়। যার নানান কাজে ব্যবহারের সঙ্গে তরল জ্বালানি হিসেবে খুবই চাহিদা আছে।

এছাড়া গাছ থেকে পাওয়া বিভিন্ন খাদ্যশস্য মানুষ ও জীবজন্তুর জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করছে। মানুষ তার নিজের এবং জীবজন্তুর শক্তিকে নানানভাবে ব্যবহারে জ্বালানির একটা বিরাট অংশ স্মরণাতীত কাল থেকে বাঁচিয়ে আসছে। আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চাষবাস, পরিবহণ জলসেচ এবং বিবিধ কাজে গরু, মোষ, ঘোড়া, উট, হাতী, গাধা, খচ্চর ব্যবহার করা হয়। কোন কোন দেশে এমনকি কুকুর এবং হরিণকেও কাজে লাগান হয়। এতে মূল্যবান জ্বালানির সাশ্রয় হয়েছে। এগুলি আসলে সৌরশক্তির পরোক্ষ ব্যবহার। গাছের ওপর আপতিত রশ্মির মাত্র 0·1—0·2% সালোক সংশ্লেষণে ব্যবহার হয়। তবে কিছু কিছু অ্যালগি 0·2—0·6% রশ্মি একাজে ব্যবহার করতে পারে।

সৌরশক্তির জন্য কৃত্রিম উপগ্রহ স্টেশন

ভূপৃষ্ঠের 35,800 কিলোমিটার উঁচুতে ভূসমলয় কক্ষে কৃত্রিম উপগ্রহকে স্থাপন করে এবং ঐ উপগ্রহে বৃহৎ ফটোভোল্টাইক সৌরকোষ প্যানেল দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ঐ বিদ্যুৎকে অনুতরঙ্গের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠে পাঠানো এবং কোন এক বিশেষ স্থানে প্রেরিত ঐ বিদ্যুৎশক্তিকে গ্রাহকযন্ত্রে ধরে পৃথিবীতে বিদ্যুতের জোগান দেওয়া যেতে পারে। সৌরশক্তির জন্য কৃত্রিম উপগ্রহ স্টেশনের প্রধান সুবিধা হলো এই যে (i) এই স্থানে নিরবচ্ছিন্নভাবে সৌরশক্তি পাওয়া যায়। (ii) ভূসমলয় কক্ষে স্থাপিত উপগ্রহে সূর্যরশ্মি আবহ ভেদ করে আসে না বলে রশ্মির তীব্রতা যথেষ্ট থাকে। (iii) এত উঁচুতে ধূলোবালির কণা না থাকায় সৌরশক্তির তীব্রতা কমাতে পারে না এবং কোষ বা লেন্স বা আয়নাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার প্রয়োজন হয় না। এগুলি সব সময় ধূলোবালি মুক্ত থাকে।

এই কাজের প্রধান অসুবিধা হল এই যে (i) বৃহদাকারে সৌর প্যানেল বা পাখনা লাগানো দরকার। ফলে উপগ্রহর ওজন বেশি হবে। (ii) উপগ্রহকে পাঠানোর প্রাথমিক খরচ খুবই বেশি এবং ঐ উপগ্রহকে নিখুঁতভাবে ভূসমলয় কক্ষে স্থাপন করতে হবে। (iii) পৃথিবীতে অবস্থিত গ্রাহক যন্ত্রে আকার ও আয়তন খুবই বড় প্রয়োজন। গ্রাহক অ্যাণ্টেনার ব্যাস কমপক্ষে এক কিলোমিটার হতে হবে। তবে ব্যাস সাত কিলোমিটার হলে কার্যদক্ষতা সর্বাধিক। এটি প্রস্তাবিত হয়েছে এবং প্রস্তুতের চেষ্টা হচ্ছে।

জলশক্তি

গতিযুক্ত জলের ভরগতি থেকে আমরা শক্তি উৎপাদন করতে পারি। যেমন স্রোতযুক্ত নদীর থেকে বা জোয়ার ভাঁটা থেকে। এমনকি সমুদ্রস্রোত থেকেও শক্তি উৎপাদন করা যেতে পারে। জোয়ার-ভাঁটা এবং সমুদ্র স্রোত থেকে শক্তি উৎপাদন সমুদ্র শক্তির মধ্যে আলোচনা করব।

ভূ-পৃষ্ঠে আপতিত সূর্যরশ্মির একটি অংশ নদী, নালা, খাল, বিল এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের জলরাশিকে বাষ্পীভূত করতে এবং ঐ জলীয় বাষ্পকে আকাশে তুলতে ব্যয় হয়। ঊর্ধ্বাকাশে ঐ জলীয় বাষ্প থেকে মেঘ এবং মেঘ থেকে বৃষ্টির আকারে পাহাড় পর্বত বেয়ে নদীনালারূপে ঐ জল পুনরায় সমুদ্রে ফিরে আসে। জলের এই পর্যায়বৃত্ত অবিরাম গতিকে 'জলবৃত্ত' (hydrological circle) বলে। জলকে বাষ্পীভূত করতে এবং ঊর্ধ্বাকাশে তুলতে যে সৌরশক্তি ব্যয় হয় তা বাষ্পের ঘনীভবন দ্বারা পুনরায় উন্মুক্ত হয় এবং কিছুটা মেঘের জলকণায় স্থিতিশক্তিরূপে থেকে যায়। পড়ন্ত বৃষ্টির শক্তিকে কাজে লাগানোর পথ আমাদের জানা নেই। কেবলমাত্র যে জল পাহাড় পর্বতের গায় বেয়ে সবেগে নিচে পড়ছে কেবল সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যান্ত্রিক শক্তি বা বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। জলের এই গতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হলে তাকে জলবিদ্যুৎ বলে।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনেক আগে জলশক্তির (waterpower) সাহায্যে উপযুক্ত যন্ত্র দিয়ে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করা হয়েছে। ঐ সকল যন্ত্রকে মিল বা কল বলা হতো। কেউ কেউ মনে করেন আজ থেকে প্রায় 3000 হাজার বছর পূর্বে জলশক্তির সাহায্যে মিল চালিয়ে শস্য পেষাই করা হতো। 300 খ্রীঃ পূর্বাব্দে গ্রীসে জলচক্র মিল ব্যবহার হতো এবং সমসাময়িক সময় রোমেও জলশক্তির ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল। জলশক্তি দিয়ে মিল চালাতে প্রয়োজন হতো দক্ষ লোক, যাদের স্থপতি (engineer) বলা হতো। এই সব স্থপতিরা জলশক্তি ব্যবহারে সস্তায়, সহজে বিরাট আকারের মিল চালাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। গ্রীসের জলচক্র মিলের ক্ষমতা ছিল কম; কিন্তু রোমানরা এই জলচক্র মিলের শক্তি প্রচুর বাড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। রোমের বারবেগালে (Barbegal) অবস্থিত জলচক্র মিলটি ঘণ্টায় 2·8 টন ময়দা উৎপন্ন করতে পারতো। জলচক্র মিল দেখেই নাকি প্যাডেলের সাহায্যে নৌকা চালাবার মতলবটা মানুষের মনে আসে।

জলচক্র মিল দিয়ে যে কেবল শস্য পেষাই করা হতো তা নয়, ক্রমশ এদিয়ে পাথর ভাঙ্গা, করাত কল চালানো, খনি থেকে জল তুলে ফেলা প্রভৃতি নানা কাজে লাগানো হতো। যতদিন যেতে লাগলো জলচক্র মিলের সংখ্যা, আকার এবং কার্য-

ক্ষমতা বাড়তে লাগলো। 1854 খ্রীষ্টাব্দে Laxcy, Isle of Man-এ যে বিশাল জলচক্র মিলটি বসানো হয়েছিল তার শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ছিল 150 অশ্বশক্তি। আমাদের দেশে পাহাড়ী অঞ্চলে এখনো অনেক জলচক্র মিল দেখতে পাওয়া যায়। যার সাহায্যে পেষাই ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

1800 খ্রীষ্টাব্দে প্রথম হাইড্রোলিক রিঅ্যাকশন্ টারবাইন (hydroulic reaction turbine) উদ্ভাবিত হয়। 1827 খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে M. Fourmynon চার বছরের চেষ্টায় প্রথম a radial outward flow টারবাইন বসান।

1882 খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় Appleton-এ প্রথম 125 কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এরপর থেকে পৃথিবীর নানাদেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়ে গেল। এবং উৎপাদন কেন্দ্র থেকে তারের সাহায্যে বহুদূরে নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে।

1900 খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে পাম্প স্টোরেজ প্ল্যান্ট স্থাপিত হয়। জলবিদ্যুৎ তার শতবর্ষ পূরণ করেছে। তবুও তেমনভাবে এই উৎসটিকে কাজে লাগানো হয়নি। পৃথিবীর মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাত্র 27% হলো এই জলবিদ্যুৎ। যেটি মোট শক্তি উৎপাদনের তুলনায় খুবই নগণ্য। মাত্র 4%।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রথমেই দরকার একটা স্রোতস্বিনী বা নদী। যার স্রোতকে বাঁধ দিয়ে আটকে একটা জলাশয় সৃষ্টি করা হয়। ঐ জলাশয়ের সংরক্ষিত জলের নিয়ন্ত্রিত প্রবাহের সাহায্যে টারবাইন চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। জলের পরিমাণ এবং গতির ওপর বিদ্যুৎ উৎপাদন নির্ভর করে। অর্থাৎ জল প্রবাহের পরিমাণ এবং জলের চাপযন্ত্রে যেখানে প্রবেশ করছে তার ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ জলাশয়ের জলের তল ও টারবাইনের মধ্যে উল্লম্ব দূরত্বের ওপর যা নির্ভরশীল। যেহেতু নদীর জলের প্রবাহ বছরে সব সময় সমান থাকে না, তাই জলের পরিমাণ মোটামুটি নির্দিষ্ট রাখতে নদীর ওপর বাঁধ দিতে হয়। কারণ বর্ষার অতিরিক্ত জল শুখা মরশুমে ব্যবহার করা যায়। জলাশয় এবং টারবাইনের মধ্যে উল্লম্ব দূরত্ব যত বাড়বে জলের চাপ তত বাড়বে। যার সাহায্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। তাই পাহাড়ী অঞ্চলে সাধারণত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। আমাদের দেশে ভাকরানাঙ্গাল, মাইথন, জলঢাকা ইত্যাদি অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। আমাদের দেশে জলবিদ্যুতের সম্ভাবনা প্রচুর এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অনেক পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। যেমন বিয়াস, সালাল, কোয়েলকায়া ইত্যাদি।

জলশক্তির সুবিধা

জলশক্তি উৎপাদনে জীবাশ্ম শক্তির প্রয়োজন হয় না। এই শক্তির উৎসটি পুনর্নবীভবন যোগ্য এবং এর জন্য কোন ব্যয় নেই। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে পরিবেশ দূষিত হয় না। এতে রাসায়নিক দূষণ এবং তাপ দূষণ (thermal pollution) হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে শূন্য। বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যয় কম এবং উৎপাদন যন্ত্রের কর্মদক্ষতা খুবই বেশী। কেবলমাত্র রক্ষণাবেক্ষণের খরচ আছে। তবে তা নিতান্তই কম। জলবিদ্যুতের জন্যে নির্মিত বাঁধ বর্ষার সময় অতিরিক্ত জলকে সঞ্চয় করে রেখে প্লাবনের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করে এবং শুখা মরশুমে ঐ অতিরিক্ত জল চাষ আবাদে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রে সহজে উৎপাদন শুরু ও বন্ধ করা যায়। পাম্প স্টোরেজের সাহায্যে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ শক্তিকে সংরক্ষণ সম্ভব। কৃত্রিম জলাশয়ে মাছ চাষ করা যেতে পারে।

অসুবিধা

জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে প্রাথমিক ব্যয় প্রচুর। কারণ বাঁধ ও কৃত্রিম জলাশয় নির্মাণে খরচ খুবই বেশী। উৎপাদন কেন্দ্র থেকে জলবিদ্যুৎ ব্যবহার অঞ্চলে পরিবহণে (তারের সাহায্যে) খরচ অনেক। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য যথাসম্ভব পলি ও পাথর নুড়ি মুক্ত জল প্রয়োজন। পলি ও পাথর অনেক জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রকে বিকল করে দিয়েছে। পলি ও পাথর নুড়ি মুক্ত করার নানা উপায় আছে এবং আজকাল তা ব্যবহার করা হচ্ছে। পলি পড়ে জলাশয়ের গভীরতা কমে গেলে উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং প্লাবনের আশঙ্কা থাকে। তাই পলিমুক্ত করতে ড্রেজিংয়ের প্রয়োজন হয়। যাতে খরচ বিস্তর। কৃত্রিম জলাশয়ের জন্য প্রচুর কৃষিযোগ্য জমি প্রয়োজন হতে পারে। এটিও একটা বড় রকমের অসুবিধা। প্রচণ্ড শুখা মরশুমে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কমে বা একেবারে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। জলের বাঁধের কোনকিছুর ত্রুটি হলে তার পরিণাম ভয়ংকর হতে পারে এবং বাঁধ ভেঙ্গে গেলে প্লাবনের আশঙ্কা তো আছেই। পৃথিবীর সব দেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব নয়।

তবুও এই পুনর্নবীভবন যোগ্য উৎসকে আরো বেশী করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কাজে লাগাতে হবে জীবাশ্ম জ্বালানি বাঁচাতে এবং পরিবেশ দূষণ মুক্ত রাখতে।

জলশক্তির সংরক্ষণ

আমাদের দেশে বিদ্যুতের প্রচুর ঘাটতি থাকলেও পৃথিবীর সবদেশের অবস্থা

ঠিক এরকম নয়। যে কোন দেশের বিদ্যুতের চাহিদা দিনে ও রাতে এবং বিভিন্ন ঋতুতে সমান নয়। যেমন যে কোন দেশে দিনের বেলায় বিদ্যুতের যত চাহিদা থাকে রাতে তার চেয়ে কম হয়। আবার গরম বা প্রচণ্ড শীতের সময় (বিশেষ করে শীতপ্রধান দেশের) বিদ্যুতের চাহিদা অন্য সময়ের থেকে বেশী থাকে। কিন্তু কোন একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা নির্দিষ্ট। বিদ্যুতের চাহিদা কমে গেলেও উৎপাদন অব্যাহত থাকে। ফলে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ অপচয় হয়। কারণ চাহিদা অনুযায়ী জলবিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রে উৎপাদন হ্রাস বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।

তাই এই অতিরিক্ত বিদ্যুৎশক্তিকে সংরক্ষণ করা হয় এই পাম্পস্টোরেজের সাহায্যে। চাহিদা যখন কমে যায় সেই সময়ে অতিরিক্ত বিদ্যুতের সাহায্যে নিচের কোন জলাশয় থেকে জল পাম্প করে উঁচুতে অবস্থিত বাঁধ দেওয়া জলাশয়ে তুলে শক্তি সংরক্ষণ করা হয়। প্রয়োজনে এবং বিশেষ করে শুখা মরশুমে এই জল দিয়ে উৎপাদন যন্ত্র সচল রাখা যায়।

1900 খ্রীষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডের Etzel-এ প্রথম পাম্প স্টোরেজ ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়। এই পদ্ধতিতে ঠিক যতটা বিদ্যুৎশক্তি ব্যয় করে যতটা জল তোলা হয় তার থেকে ঠিক ততটা বিদ্যুৎ কখনই পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ পাম্পের ঘর্ষণ, জল বাষ্পীভূত হয়ে যাওয়া এবং বাঁধের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া ইত্যাদি নানা কারণের সঙ্গে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রের কার্যদক্ষতা একটা কারণ। কোন যন্ত্রেরই কার্যদক্ষতা 100% সম্ভব নয়।

বায়ুশক্তি

বাতাসের (গতি) শক্তিকে প্রথম কাজে লাগানো হয় পালতোলা নৌকা আর জাহাজ চালাতে। সেটি খুবই প্রাচীন। 1879 খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাষ্পীয় জাহাজ চালানো শুরু হবার পর থেকে পালতোলা জাহাজ আস্তে আস্তে কমতে থাকে এবং বর্তমানে পালতোলা জাহাজ না থাকলেও পালতোলা নৌকা এখনও সংখ্যায় প্রচুর। পালতোলা জাহাজ বা নৌকার প্রধান ভরসা এই বাতাসের গতি আর বাতাস পড়ে গেলে অর্থাৎ গতি কমে গেলে মাঝ সাগরে জাহাজের অবস্থা খুবই কাহিল হতো। যার থেকে অশ্ব অক্ষাংশের (horse latitude) উৎপত্তি তা আমরা সবাই জানি। আবার বাতাসের গতি বেশী হলেও ছিল মারাত্মক বিপদ। ঝড়ের মুখে জাহাজ পড়ে কত জাহাজ যে ডুবেছে তা ঠিক ঠিকানা নেই। আর প্রতি জাহাজের সঙ্গে

কত প্রাণ কত সম্পত্তি যে নষ্ট হয়েছে তারও অন্ত নেই। এছাড়া বাতাসের গতির দিকের ওপর নানান ব্যাপার নির্ভর করত। এই পালতোলা জাহাজের সময় রক্ষা করা একটা কঠিন বিষয় ছিল। তাই বাষ্পীয় জাহাজের সঙ্গে এই পালতোলা জাহাজ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে এবং শেষে উঠে যায়।

খ্রীঃ পূঃ 250-এ পারস্যের লোকেরা বায়ু-মিল (windmill) উদ্ভাবন করে বাতাসের শক্তিকে কাজে লাগায়। যেটি আজও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এদের উদ্ভাবিত বায়ু-মিলে ছিল উল্লম্ব (vertical) দণ্ডের ওপর পাখা লাগানো। বাতাস প্রবাহিত হলে ঐ পাখা ঘুরতো, ফলে দণ্ডটি ঘুরতো এবং মিল চলতো। এই বায়ু-মিলের সাহায্যে নানান জিনিস গুড়ো ও পেষাই করা এবং জল পাম্প করা হতো।

পারস্যের এই উল্লম্ব বায়ু-মিল আরব দেশে অনুভূমিক দণ্ডে রূপান্তরিত হয় এবং এই অনুভূমিক (horizental) দণ্ড বায়ু-মিল একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে চলে আসে। ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে হল্যাণ্ড (নেদারল্যাণ্ড) এই বায়ু-মিলের নানাবিধ উন্নতি বিধান করে নানা কাজে লাগিয়ে ১৭শ শতাব্দীতে শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। হল্যাণ্ডে এই অনুভূমিক বায়ু-মিলের এত প্রচলন ও কদর ছিল যে এই বায়ু-মিলের প্রতীক দিয়ে হল্যাণ্ড দেশকে বোঝান হয়।

বাতাসের গতিশক্তিকে প্রয়োজনীয় কাজে লাগানো হয়। বাতাসের মোট বাৎসরিক গতিশক্তির পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। প্রায় 10^{17} কিলোওয়াট ঘণ্টা। এই পরিমাণ শক্তির মধ্যে কেবল স্থলভাগের শক্তিকেই বায়ু-মিলে ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীর কোনস্থানের ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর বায়ুপ্রবাহ এবং তার গতি নির্ভর করে। বায়ুর গতির মাত্রা বিভিন্ন ঋতুর ওপরও নির্ভর করে। যেহেতু বায়ুর গতির মাত্রার ওপর বায়ু-মিলের ক্ষমতা নির্ভর করে, এবং কোন স্থানের বায়ুশক্তির মাত্রারও বিশেষ হেরফের হয়। একটা নির্দিষ্ট উচ্চতার মধ্যে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যত ওপরে ওঠা যাবে বাতাসের গতি তত বাড়বে। সাধারণত মাটির থেকে কুড়ি ফুট উঁচুতে বাতাসের গতি থাকে 8—12 মিটার প্রতি সেকেণ্ডে। বায়ু-মিল হল এক ঘূর্ণায়মান যন্ত্র যা বায়ুর (বাতাসে অবস্থিত বিভিন্ন অণুর) ভরগতি থেকে শক্তি আহরণ করতে পারে, যে (পরিমাণ) বাতাস এই বায়ুমিলের পাখা দিয়ে অতিক্রম করে। সুতরাং বায়ুমিলের ক্ষমতা নির্ভর করবে (i) বায়ুর গতি, (ii) বায়ুর ঘনত্ব, এবং (iii) পাখার আয়তন ও ঘূর্ণায়মান পাখার ব্যাস ইত্যাদির ওপর।

সমুদ্রের তীরে বা পাহাড়ের মাথায় বায়ুর গতি বেশী বলে সাধারণত বায়ু-মিল এই জায়গায় বসানো হয়। কিংবা টাওয়ার তৈরি করে বায়ু-মিল বসানো হয়।

বাষ্পীয় ইঞ্জিন এবং তেল ইঞ্জিন আসার পর বায়ুমিলের ব্যবহার একদম কমে

যায়। কিন্তু বর্তমানে জ্বালানি সংকটে এই বায়ু-মিলকে জল তোলার কাজে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হচ্ছে। আজকাল অনেক বাড়ীতে ট্যাংকে জল তোলার কাজে এই বায়ু-মিল ব্যবহার করা হচ্ছে এবং জমিতে জলসেচ করতেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে জ্বালানির ব্যবহার নেই। ফলে পরিবেশ দূষণের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এটা খুব ছোট আকারে ব্যবহার করা চলে। সেই রকম বিদ্যুৎ উৎপাদনও ছোট আকারে করা যেতে পারে। বায়ু-মিলের দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান সমস্যা হলো বাতাসের অনিয়মিত প্রবাহ। অর্থাৎ বাতাসের গতি কমে গেলে উৎপাদনও ব্যাহত হবে। এই অসুবিধা দূর করতে সঞ্চায়ক কোষ (charging cell) চার্জ করতে বায়ু-মিল দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহার করা চলে। ফলে বিদ্যুতের ধারা অব্যাহত থাকবে।

1890 খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্কের পল লাকোর (Paul Lacoure) একটি বায়ু-মিল নির্মাণ করে তার সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র যোগ করেন। বায়ু-মিলের প্রত্যেকটি পাখা 8·25 ফুট চওড়া ছিল এবং পাখার ব্যাস ছিল 75 ফুট। বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রে লাগানো ছিল দুটো নয় কিলোওয়াট ইঞ্জিন। এই বিদ্যুতের সাহায্যে তিনি তাঁর স্কুলকে আলোকিত করেন।

এরপর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়ায় আরো বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র বায়ু-মিল দিয়ে চালানো হতে লাগলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Vermout-এ 2000 ফুট পাহাড়ের চূড়ায় দু'পাখাওয়ালা একটি বায়ু-মিল বসানো হলো। যার দুই পাখা বা ব্লেডের দুই মাথার মধ্যে দূরত্ব হলো 175 ফুট এবং প্রত্যেকটি ব্লেডের ওজন ছিল আট টন যা স্টেনলেশ স্টিল দিয়ে তৈরী। এই বায়ু-মিলটি 110 ফুট টাওয়ারের ওপর বসানো ছিল। মিলটির ব্লেডের ঘোরার হার ছিল (28·7 ঘূর্ণন প্রতি মিনিটে) নির্দিষ্ট এবং সেটি বজায় রাখা হতো। ব্লেডের আকার ও ব্যাস যত বড় হবে তত বেশী বাতাসের শক্তিকে কাজে লাগানো যাবে। আর এর জন্যই ব্লেডের আকার এত বিশাল করা হতো। বড় পাখার খরচ ও ঝামেলা অনেক। এই বায়ু-মিলের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র থেকে 1250 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যেতো এবং 1942 খ্রীষ্টাব্দে এর থেকে 179000 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা গেছে। পরে এটির বেয়ারিং (bearing) খারাপ হয়ে যায় বলে তা পাল্টে পুনরায় চালু করার সময় একটি ব্লেড খারাপ হয়ে যায়। পরে এটিকে খুলে ফেলা হয়।

পরে এই ধরনের বায়ুমিলের অনেক উন্নতি করা হয় এবং ব্লেডের ব্যাস 200 ফুট পর্যন্ত করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় কমানো হয়। অনেক দেশে বায়ু টারবাইন সিস্টেমকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। কিন্তু এই যন্ত্রের সাহায্যে

উৎপাদিত বিদ্যুতের দাম বেশী পড়ায় এই বায়ু টারবাইন সিস্টেম (wind turbine system) উঠে গেল।

বায়ু-মিলের প্রধান সুবিধা হলো এই যে (i) কোন প্রাকৃতিক শক্তি নষ্ট হয় না, (ii) সম্পূর্ণ দূষণ মুক্ত (iii) যে শক্তি ব্যয় হয় তার কোন দাম পড়ে না। আর অসুবিধা হলো (i) বাতাসের থেকে প্রাপ্ত শক্তির তারতম্য হয় বলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের হেরফের হয়, (ii) যন্ত্রটি বসাতে খরচ প্রচুর, কারণ এর সঙ্গে একটি সংরক্ষণ সিস্টেম চালু রাখতে হয়।

বর্তমানকালে বাতাসের থেকে শক্তি আহরণের কথা বিশেষ ভাবে চিন্তা করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এটি শক্তির একটি বড় উৎস হবে। এর উন্নতিতে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

পারস্যে উদ্ভাবিত বায়ু-মিলে উল্লম্ব দণ্ডে পাখা লাগানো ছিল। কিন্তু আরব দেশ থেকে যে বায়ু-মিল ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে বিশেষ করে হল্যাণ্ডে, তাতে অনুভূমিক দণ্ডে পাখা লাগানো ছিল। ডাচেরা এই অনুভূমিক বায়ু-মিলের উন্নতি সাধন করলেও এটি প্রধান অসুবিধা হলো যে, বাতাসের দিক পরিবর্তন করলে এই মিল কাজ করতো না। কিন্তু উল্লম্ব বায়ু-মিলে এ অসুবিধে ছিল না। ফলে অনেকে এটির উন্নতি করতে চেষ্টা করেন। একাজে 1927 খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের G.I.M. Darrieus এক বিশেষ ধরনের উল্লম্ব বায়ু-মিল নির্মাণ করেন এবং এছাড়া ফিনিশ (Finish) ইঞ্জিনিয়ার S. J. Savonius 1929 খ্রীষ্টাব্দে S রোটর (S rotor) নামে আর এক বিশেষ উল্লম্ব বায়ু-মিল নির্মাণ করেন। এগুলি ছিল বাতাস প্রবাহের দিক নিরপেক্ষ। অতএব যে কোন দিক দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হলেও এই বায়ু-মিলগুলি কাজ করতো। বর্তমানে Darrieus এবং Savonious উদ্ভাবিত উভয়প্রকার বায়ু-মিল যুক্ত করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা হচ্ছে। এক্ষেত্রে Darrieus যন্ত্রের ওপর ও নিচে Savonius S রোটার যোগ করে যন্ত্রের কার্যক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে।

বাতাসের দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুতের সংরক্ষণ

বাতাসের দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান অসুবিধা হলো বাতাসের অনিয়মিত প্রবাহ। ফলে উৎপাদনের তারতম্য হয়। তাই বিদ্যুতের ধারা বজায় রাখতে চাই উপযুক্ত সংরক্ষণ। বাতাসের দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুৎ নানাভাবে সংরক্ষিত করা যায়। বাতাসের দ্বারা সাধারণত D.C. উৎপাদন করা যায়। এই D.C. দিয়ে লেড ব্যাটারীকে চার্জ করে বিদ্যুৎ সংরক্ষণ করা যেতে পারে। ব্যাটারীকে চার্জ

করে কম মাত্রায় বিদ্যুৎ সংরক্ষণ সম্ভব। কিন্তু বিশাল পরিমাণ শক্তিকে সংরক্ষণ করতে হলে ঐ বিদ্যুৎ দিয়ে জল পাম্প করে উঁচু জলাশয়ে তুলে রাখা হয়। পরে উঁচুতে জমা করা জল থেকে টারবাইন চালিয়ে পুনরার বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। তবে এইভাবে সংরক্ষিত শক্তির অনেকটা অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করতে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। জলের বদলে বাতাসকে উচ্চচাপে ধরে রেখে তা দিয়ে টারবাইন চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে দক্ষতা বেশী হলেও অন্যান্য অনেক অসুবিধা আছে।

এছাড়া বাতাস দিয়ে উৎপাদিত অতিরিক্ত বিদ্যুতের সাহায্যে জলের তড়িৎ বিশ্লেষণে উৎপন্ন হাইড্রোজেনকে উচ্চচাপে সংরক্ষিত করা যেতে পারে এবং ঐ হাইড্রোজেনকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে পুনরায় শক্তি আহরণ করা যেতে পারে। জলের তড়িৎ বিশ্লেষণে হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনও উৎপন্ন হয়। যা নানাকাজে লাগে।

এছাড়া ফ্লাইহুইলের সাহায্যেও শক্তি সংরক্ষণ সম্ভব।

সমুদ্র শক্তি

সমুদ্র থেকে চার উপায়ে শক্তি আহরণ করা যায় (i) সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা শক্তি (tidal energy), (ii) সমুদ্রের তাপ শক্তির রূপান্তর (Ocean thermal energy), (iii) সমুদ্র স্রোত (Ocean current), (iv) সমুদ্র জলের লবণাক্তের পার্থক্য থেকে। এছাড়া সমুদ্র জলের ঢেউয়ে প্রচুর শক্তি নিহিত আছে, যার থেকে শক্তি আহরণের কথা ভাবা হচ্ছে। যেহেতু সমুদ্রের আকার ও আয়তন বিরাট তাই সমুদ্রে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণও বিরাট। সমুদ্রের শক্তির জোগানদার হলো সূর্যরশ্মি। আর সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার শক্তি জোগাচ্ছে চন্দ্র সূর্যের সম্মিলিত আকর্ষণ। সমুদ্র থেকে শক্তি আহরণ বেশ খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার।

জো য়া র ভাঁ টা থে কে প্রা প্ত শ ক্তি

১১শ শতাব্দী থেকে ফ্রান্স, ব্রিটেন, স্পেনে জোয়ারের শক্তি দিয়ে মিল চালানো হয়ে আসছে। ইউরোপে জলচক্র মিল বায়ু-মিলের সমসাময়িক। ১৬শ শতাব্দীতে কুড়ি ফুট জলচক্র (water wheel) মিলটি লণ্ডন ব্রীজের তলায় বসানো হয়েছিল। এটির সাহায্যে জল সরবরাহের জন্য পাম্প চালানো হত। একাদশ শতাব্দীতে

জোয়ারের জলের সাহায্যে যে মিল চালানো হতো, সেই মিল পরে সপ্তদশ শতাব্দীতে আমেরিকায় ব্যবহার করা হত।

জোয়ারের স্রোতের দরুন সমুদ্রে প্রায় 3×10^{12} ওয়াট শক্তি সঞ্চিত আছে। জোয়ারের শক্তি দিয়ে 10—50 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ এক একটি যন্ত্রে উৎপাদন করা যেতে পারে। যা দিয়ে পেষাই ও গুড়ো করা কাজে ব্যবহার চলে।

চাঁদ ও সূর্যের মিলিত আকর্ষণের ফলে জোয়ার-ভাঁটা হয়। চাঁদ, সূর্য ও পৃথিবী এক সরল রেখায় থাকলে (অর্থাৎ প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যায়) যে জোয়ার হবে তার প্রাবল্য হবে সর্বাধিক। তাকে ভরা কোটাল বলে। কিন্তু চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্য সমকোণে থাকলে জোয়ারের প্রাবল্য হবে সবচেয়ে কম। একে মরা কোটাল বলে। অবশ্য পৃথিবী থেকে চাঁদ ও সূর্যের দূরত্বের ওপরও প্রাবল্য নির্ভর করে। চাঁদ পৃথিবীর খুব কাছে আছে সূর্যের তুলনায়। তাই চাঁদের প্রভাব জোয়ারের ওপর খুব বেশী।

মুক্ত সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটার মধ্যে জলের তলের পার্থক্য সাধারণত দু ফুটের মত হয়। মহাদেশীয় সোপানে (Continental sheelves) এই পার্থক্য প্রায় ছ ফুটের মত হয়। নদীর মোহনায় এবং খাড়ীতে এই পার্থক্য প্রায় ত্রিশ ফুটের মত। কানাডার Bay of Fundy-তে এই পার্থক্য প্রায় 50 ফুট, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী। এর পরের স্থানে আছে ব্রিটেনের Seven Estuary, পার্থক্য 45 ফুট। আমাদের হুগলী নদীতে গার্ডেনরীচে জোয়ার-ভাঁটার মধ্যে পার্থক্য প্রায় 16-22 ফুট।

জোয়ার-ভাঁটার মধ্যে জল তলের পার্থক্যকে tidal range বলে। দুটি জোয়ারের জলস্তরের সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে সময়ের ব্যবধান 12 ঘণ্টা 24·4 মিনিট। অর্থাৎ 24 ঘণ্টা 48·8 মিনিটে দুটি জোয়ার ও দুটি ভাঁটা হবে। জোয়ার-ভাঁটার পার্থক্য প্রতিদিনে পরিবর্তন হয় এবং এটি ঋতুর ওপরও নির্ভরশীল।

এখন কোনস্থানে জোয়ার-ভাটা থেকে শক্তি আহরণ করতে হলে দুটি জিনিসের ওপর লক্ষ্য রাখতে হয়—(i) ঐ স্থানে জোয়ার ভাঁটার মধ্যে জলস্তরের পার্থক্য বেশ বেশী হতে হবে এবং (ii) কৃত্রিম জলাশয় নির্মাণের সুবিধা থাকা চাই।

নদীর মোহনায় বা সমুদ্র খাড়ীতে কোন স্থানে কৃত্রিম জলাশয় নির্মাণ করা হয়। জোয়ারের সময় ঐ সব জলাশয় ভর্তি হয়ে যায়। এখন বিশেষভাবে নির্মিত বাঁধ ও লকগেটের সাহায্যে ঐ জল আটকে রাখা হয়। পরে ভাঁটার সময় জলস্তরের পার্থক্যের সাহায্যে জল উল্টোদিকে প্রবাহিত করে টারবাইন চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এমনকি জোয়ারে জলাশয় ভর্তি হবার সময় জোয়ারের স্রোতের সাহায্যে টারবাইন চালানো যেতে পারে। জোয়ারের জলের গতিশক্তি এবং

জোয়ারের জলস্তরের পার্থক্যের দরুন সৃষ্ট স্থিতিশক্তিকে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করে বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সে Rance estuary-তে জোয়ার-ভাঁটা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি পৃথিবীর বৃহত্তম। এটির বাৎসরিক মোট উৎপাদন ক্ষমতা 500×10^6 কিলোওয়াট ঘণ্টা। রাশিয়ায়ও জোয়ার-ভাঁটা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

সমুদ্রের তাপশক্তির রূপান্তর

1881 খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের D. Arsonval সমুদ্রের তাপশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ইঞ্জিন চালাবার তত্ত্ব প্রথম উপস্থিত করেন। এই তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে যন্ত্র উদ্ভাবন করে প্রথম যিনি সমুদ্রের তাপশক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরে সক্ষম হন তিনি হলেন ফ্রান্সের ইঞ্জিনিয়ার জি. ক্লড (G. Claude)।

সূর্যকিরণের জন্য সমুদ্রপৃষ্ঠের জলস্তরের তাপমাত্রা সর্বাধিক বিশেষ করে নিরক্ষীয় অঞ্চলে এবং গভীরতা বাড়ার সঙ্গে এই তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে। কারণ ঠাণ্ডা জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী। তাই মেরু অঞ্চলের শীতল বরফগলা জল সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়। সমুদ্রের জলস্তরের তাপমাত্রার পার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে কার্নোর চক্রের ইঞ্জিন চালান সম্ভব। একটি জলাধারে সমুদ্রপৃষ্ঠের গরম জল এবং অপর জলাধারে সমুদ্র তলদেশের শীতল জল রাখা হয়। ফলে তাপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উষ্ণ অঞ্চল থেকে শীতল অঞ্চলে প্রবাহিত হবে। আর তাপ প্রবাহের থেকে ইঞ্জিনের সাহায্যে কার্যোপোযোগী যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। জলাধারের তাপমাত্রার পার্থক্য যত বেশী হবে ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা তত বাড়বে। তবে এই পার্থক্য 20°C-এর কম হলে চলবে না।

গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণ জল এবং ঐ অঞ্চলের সমুদ্রের গভীর অঞ্চলের শীতলজল, এই শক্তি আহরণের পক্ষে খুবই উপযোগী। আর পৃথিবীর যে অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠে উষ্ণ স্রোত এবং তলদেশে শীতল স্রোত প্রবাবিত হয়, সেই অঞ্চলে এই ধরনের ইঞ্জিন খুবই ভালভাবে কাজ করবে।

তাপমাত্রার পার্থক্যের দরুন শক্তি উৎপাদন যন্ত্র সমুদ্র উপকূলে বা গভীর সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় বসানো যেতে পারে। উৎপন্ন শক্তি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র চালানো হয়। উৎপন্ন বিদ্যুৎ তারের সাহায্যে উপকূলে নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিংবা উৎপন্ন বিদ্যুতের সাহায্যে জলের তড়িৎ বিশ্লেষণ করে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উৎপাদন করা যেতে পারে। উৎপন্ন হাইড্রোজেন আবার শক্তি উৎপাদনে ব্যবহার করা চলে।

সমুদ্র জলের তাপমাত্রার পার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে শক্তি উৎপাদনে প্রচুর লবণমুক্ত জল প্রস্তুত হয়। যাকে নানান কাজে লাগানো যেতে পারে। এই শক্তির উৎসটি ব্যাপক এবং এটি সৌরশক্তিরই একটি পরোক্ষ প্রয়োগ। উৎসটি তাই পুনর্নবীভবন যোগ্য। এই উৎস থেকে শক্তি আহরণ আবহ বা জল দূষণ হয় না এবং পৃথিবীর স্থলভাগের জায়গার প্রয়োজন নাও হতে পারে। কারণ উৎপাদন যন্ত্র মাঝ সমুদ্রে জাহাজ বা অন্য কিছুর ওপর বসানো যেতে পারে। গভীর সমুদ্রের শীতল জলে যে খনিজ পদার্থ থাকে তাকেও নানাভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।

এই উৎসটিকে কাজে লাগাতে গেলে সুবিধের সঙ্গে নানান অসুবিধাও আছে। যেমন সমুদ্রের লোনা জলের প্রভাবে যন্ত্রপাতি, পাইপ, ইত্যাদির ক্ষয়ের সমস্যাটি দারুণ মারাত্মক। অবশ্য টাইটেনিয়াম দিয়ে পাইপ ইত্যাদি তৈরী হলে ক্ষয়ের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেলেও খরচের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। অবশ্য পলিথিনের পাইপ ব্যবহারেও খরচ কম হবে এবং ক্ষয়ের হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যাবে। এই যন্ত্র চালাতে প্রচুর শীতল জল সমুদ্রের তলদেশ থেকে পাম্প করে ওপরে তুলতে হয়, ফলে উৎপন্ন শক্তির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এই পাম্প করতে ব্যয় হয়। তার ওপর তাপমাত্রার পার্থক্য কম হলে যন্ত্রের কর্মদক্ষতাও খুব কম হয়। উৎপাদন যন্ত্র সমুদ্রের মধ্যে বসাতে মুরিং করার খরচ বেশ বেশী। ফলে প্রাথমিক ব্যয় খুবই বেশী। উপকূল থেকে যতদূরে সমুদ্র মাঝে এই উৎপাদন যন্ত্র বসানো হবে শক্তি পরিবহণ ব্যয় তত বেশী পড়বে। এই যন্ত্র দিয়ে শক্তি উৎপাদনে সামুদ্রিক পরিবেশের ওপর তার প্রভাব কতটা তা জানা না গেলেও এটা ঠিক গভীর সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড বেরিয়ে এসে বায়ুমণ্ডলে এই গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে।

1931 খ্রীষ্টাব্দে কিউবায় ক্লড প্রথম সমুদ্রের তাপশক্তির সাহায্যে 22 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেন। সমুদ্রের তলদেশের শীতল জল পাম্প করার জন্য তিনি ছ ফুট ব্যাসের সোয়া একমাইল লম্বা বিশিষ্ট বিশেষ ধরনের পাইপ ব্যবহার করেন। একাজ করতে গিয়ে ঐ বিশাল পাইপ দুবার সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে যায়। যদিও তৃতীয় প্রচেষ্টায় আবার তিনি একাজে সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু তখন এই যন্ত্র বসাতে খরচ এত বেশি পড়ছিল যে অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন অনেক সহজ ছিল এবং ব্যয় অনেক কম ছিল।

এর পর ফ্রান্সের এক কোম্পানি এই পদ্ধতিতে সাত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গিয়ে শীতল জলের জন্য বিশাল পাইপ ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে উৎপাদন সম্ভব হয়নি।

রুডের উদ্ভাবিত এই যন্ত্রের নানান পরিবর্তন নানান জন করেছিলেন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা অনেক দেশই করে যাচ্ছে। 1985 খ্রীঃ মধ্যে আমেরিকায় এই পদ্ধতির সাহায্যে 100 মেগাওয়াট শক্তি উৎপাদনের চেষ্টা হচ্ছে।

ভবিষ্যতে নিরাপদ ও পুনর্নবীভবন যোগ্য এই শক্তির উৎসের ওপর আমাদের নির্ভর করতে হবে।

সমুদ্র স্রোত

সমুদ্র স্রোতের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যায়। পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য সমুদ্র স্রোত সৃষ্টি হয়, যার শক্তির পরিমাণ বিপুল, কিন্তু শক্তির ঘনত্ব খুবই কম। এই স্রোতের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে এবং সমুদ্রের মধ্যে যদি দু মুখ খোলা সিলিণ্ডার রাখা যায় এবং ঐ সিলিণ্ডারের মধ্যে জাহাজের প্রপেলারের মত পাখাওয়ালা যন্ত্র থাকে এবং যার সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র যুক্ত থাকলে, সমুদ্র স্রোতে ঐ পাখা ঘুরলে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। এই রকম অনেক সিলিণ্ডার এক সঙ্গে কাজ করলে বিদ্যুতের পরিমাণ বাড়বে।

এছাড়া সমুদ্র উপকুল থেকে কিছু দূরে যেখানে সমুদ্র স্রোত খুব বেশি সেখানে বার্জের ওপর টারবাইন বসানো হয় এবং ঐ টারবাইনকে যে রডটি ঘোরাবে তার একটি দিক সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করানো থাকে। ঐ রডটিকে ঘোরাবার জন্য অনেক প্যারাসুট দড়ির সঙ্গে বিশেষ কায়দায় যুক্ত করে একটি অবিচ্ছিন্ন চেনের মত করা হয়। এখন স্রোতের মুখে ঐ প্যারাসুটগুলি খুলে গিয়ে ঘুরতে শুরু করবে। ফলে টারবাইনের রডটিও ঘুরবে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে।

এগুলি এখনও পরীক্ষামূলক অবস্থায় আছে।

আবর্জনা থেকে শক্তি

মানুষ, গৃহপালিত জন্তু এবং বিভিন্ন শিল্প থেকে প্রতিদিন নানা প্রকার বর্জ্য পদার্থ বা আবর্জনা জমা হয়। এই সব আবর্জনা দিয়ে সাধারণত খানা ডোবা বা শহরের কাছে কোন নিচুজমি ভরাটের কাজে ব্যবহার করা হয়। এই সকল আবর্জনার মধ্যে আছে কাগজ, ছেঁড়া কাপড়, চট, আনাজের খোসা, পচা ফল ফুল, ঘাস, বিচুলি খড়, ও প্লাসটিক, কাচ, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, টিন ইত্যাদির ভাঙ্গা জিনিস এবং মলমূত্র, গোবর। এছাড়া ছাই, আধ পোড়া কয়লা, কাঠের

টুকরো এবং নানান রাসায়নিক পদার্থ। সভ্যতার যত বিকাশ ঘটছে আবর্জনার পরিমাণও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে দুর্গম হিমালয়ের এভারেস্ট পর্যন্ত এর হাত থেকে রেহাই পায়নি।

শক্তির ব্যাপারে আবর্জনাকে দুভাবে কাজে লাগানো যায় (i) আবর্জনা থেকে বিশেষ বিশেষ পদার্থকে আলাদা করে নিয়ে, তাদের বিশেষ কাজে লাগিয়ে মূল্যবান শক্তির সংরক্ষণ করা হয়; (ii) আবর্জনা থেকে সরাসরি জ্বালানি উৎপাদন বা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে।

আবর্জনা থেকে লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, টিন, জিংক, লেড ইত্যাদি ধাতব জিনিসগুলি বেছে আলাদা করে নিয়ে, পুনরায় এদের স্ক্র্যাপ (scrap) হিসেবে ব্যবহার করে, কিছু জ্বালানির সাশ্রয় করা যায়। ঐ ধাতুগুলিকে আকরিক থেকে প্রস্তুত করতে যে জ্বালানি ব্যয় করতে হতো, তা বেঁচে যায়। এতে জ্বালানি সংরক্ষণ হয়। এই জ্বালানি সংরক্ষণ ও জ্বালানি ব্যবহারের একটা প্রধান উদ্দেশ্য। কারণ এই পৃথিবীতে কয়েক প্রকার জ্বালানির পরিমাণ সীমিত। ভাঙ্গা কাচকে পুনরায় ব্যবহার করেও ঐ একই প্রকারে জ্বালানির সাশ্রয় করা হয়।

ছেঁড়া কাগজ কাপড় ইত্যাদি থেকে শক্ত বোর্ড প্রস্তুত করেও শক্তি সংরক্ষণ করা যায়। এবং ঐ বোর্ড প্রস্তুতিতে কাঁচামালের চাহিদা কমানো যায়। বোর্ড প্রস্তুতিতে কাঁচামাল হিসেবে উদ্ভিজ্জ পদার্থ বেশি ব্যবহার করা হয়। উদ্ভিজ্জ পদার্থ সংরক্ষণ ও প্রকারান্তে শক্তি সংরক্ষণ এবং এতে প্রাকৃতিক ভারসাম্যও বজায় রাখা যায়। সেটাও কম কথা নয়।

যে সব কারখানায় কয়লা ব্যবহার করা হয়, সেই সব কারখানায় প্রধান আবর্জনা হলো ছাই ও আধ পোড়া কয়লা। বর্তমানে ঐ সব আধপোড়া কয়লাকে ছাইয়ের থেকে আলাদা করে গৃহস্থের জ্বালানির চাহিদা কিছুটা মেটানো যায়। এছাড়া ঐ আধপোড়া কয়লাকে ছাইয়ের সঙ্গে গুঁড়িয়ে সুরকির বদলে বাড়ীর গাথুনীর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। উভয় ক্ষেত্রেই জ্বালানি সংরক্ষণ হচ্ছে।

ধাতু নির্মিত জিনিস, কাগজ, কাপড়, কাচ পোড়া কয়লা ছাই এবং প্লাস্টিক আবর্জনা থেকে চলে গেলে বাকি পড়ে থাকে মানুষ ও গৃহপালিত জন্তুর মলমূত্র, (নর্দমার জল), আনাজ ও শস্যের খোসা, পাতা, আঁটি, বীজ, ছিবড়ে প্রভৃতি। এসব আবর্জনার মধ্যে 50—60% হলো দাহ্য পদার্থ। সুতরাং এগুলি রোদে শুকিয়ে নিয়ে ভালোভাবে বাষ্প উৎপাদনে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

আমাদের দেশে গরু মোষের গোবর থেকে ঘুটে তৈরি করে জ্বালানি হিসেবে বহুদিন ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে। এতে আমরা কাঠ ও জীবাশ্ম জ্বালানির এক উল্লেখযোগ্য অংশ সংরক্ষণ করতে পেরেছি এবং পারছি। গোবর এবং হাঁস মুরগীর

পোল্ট্রি থেকে যে বিষ্ঠা পাওয়া যায় তা থেকে উত্তম সার তৈরি করা যায় এবং সারের চাহিদার একটা অংশ পূরণ করে। এতে সার প্রস্তুতিতে জ্বালানির একটা অংশও সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে।

আজকাল আমাদের দেশে গোবর গ্যাস প্ল্যাণ্ট খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। এই প্ল্যাণ্টে গোবর ব্যবহার করে যে গ্যাস পাওয়া যায় তা দিয়ে রান্নার জন্য তাপ এবং বাড়ীতে আলো সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। গ্যাস প্রস্তুতের পর গোবরের যে অংশ পড়ে থাকে তা খুব ভালো সার। গোবর গ্যাস প্ল্যাণ্টে ব্যবহারে পরিবেশ দূষণের থেকে রক্ষা পায় এবং এতে প্রচুর শক্তি সংরক্ষণ সম্ভব।

কোন শহরের মলমূত্র ও নর্দমার জল আর নিকটবর্তী নদী, জলাশয় বা সমুদ্রে ফেলা হয় না, পরিবেশ দূষণের জন্য। এইসব আবর্জনায় পচনশীল জৈব যৌগ বর্তমান। যারা পচনের সময় জলের অক্সিজেন নিয়ে নেয়। ফলে এ জলে জলজ জন্তু, মাছ ও গাছ বাঁচতে পারে না। এই জলকে বিশেষ ভাবে বিশোধন করে চাষের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই জলে সারও প্রচুর থাকে।

কঠিন আবর্জনা থেকে তিন উপায়ে শক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে। (i) বিশেষ ভস্মীকরণ যন্ত্র থেকে সরাসরি তাপ উদ্ধার, (ii) শক্তির উৎপাদন যন্ত্রে সম্পূরক জ্বালানি হিসেবে আবর্জনার ব্যবহার, (iii) আবর্জনা থেকে সংশ্লেষণ জ্বালানি প্রস্তুতি।

কঠিন আবর্জনাতে অজ্বলনশীল পদার্থ 50%-এর কম, জল 25%-এর কম এবং জ্বালানি 25%-এর বেশী থাকলে, ঐ কঠিন আবর্জনা থেকে ধাতব পদার্থ আলাদা করে রোদে শুকিয়ে নিয়ে ভস্মীকরণ যন্ত্রে পুড়িয়ে তাপ উৎপাদন করা যায়। ঐ তাপ দিয়ে জলীয় বাষ্প উৎপাদন করে বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র চালানো যায়। কঠিন আবর্জনা থেকে চিকাগো, সুইজারল্যাণ্ডের বের্ণ (Bern) শহর, প্যারিস, মণ্ট্রিল, কুইবেক প্রভৃতি শহরে বাষ্প উৎপাদন করা হয়। ঐ বাষ্প গৃহস্থালীর কাজে, শিল্পে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়।

অন্যান্য অনেক দেশে আবর্জনা থেকে বাষ্প উৎপাদনের চেষ্টা হচ্ছে। অনেক সময় এই কঠিন আবর্জনাকে হাতুড়ির আঘাতে টুকরো করে কনভেয়ারের সাহায্যে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কনভেয়ারের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় চৌম্বকের সাহায্যে লৌহ নির্মিত পদার্থকে আলাদা করা হয়। এছাড়া বাতাসের সাহায্যে অজ্বলনশীল পদার্থকে আলাদা করা হয়। পরে এই জ্বালানিকে রোদে শুকিয়ে কয়লার সঙ্গে মিশিয়ে বাষ্প উৎপাদন যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়। কঠিন আবর্জনার একটা বড় সুবিধা হলো যে এতে সালফারের পরিমাণ কম থাকায় এটি জ্বলানি হিসেবে

ব্যবহারে বাতাসের সালফার দূষণ কম হয়। আবর্জনার অসুবিধা হলো এর আয়তন এবং এর জ্বালানির মান বেশ কম।

আবর্জনা থেকে তিন উপায়ে সংশ্লেষণ জ্বালানি প্রস্তুত করা যায়— (i) হাইড্রোজিনেশানের দ্বারা, (ii) উচ্চ তাপাঙ্কে উত্তপ্ত করে, (iii) বায়ো-কনভারসান (bio-conversion) দ্বারা।

(i) হাইড্রোজিনেশান ঃ পৌর আবর্জনায় উপস্থিত সেলুলোজ থেকে অক্সিজেনকে কার্বন মনোক্সাইড ও জলীয় বাষ্প দিয়ে অপসারণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় জৈব আবর্জনার সঙ্গে 5% সোডিয়াম কার্বনেট মিশিয়ে উচ্চ বাষ্প চাপে 240° থেকে 270°C-এ ঘণ্টাখানেক উত্তপ্ত করা হয়। এতে প্রতি টন আবর্জনা থেকে প্রায় দু ব্যারেল তেল উৎপন্ন হয়। এই পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হলো যে যন্ত্রে এটি করা হয় সেটি অত্যন্ত মজবুত হওয়া দরকার। যাতে যন্ত্রটি উচ্চ চাপ সহ্য করতে পারে। এটি বেশ খরচ সাপেক্ষ। এছাড়া উৎপাদিত তেলের একটা অংশ বয়লারে ব্যবহার করতে হয়। তবে এই তেলে সালফারের পরিমাণ প্রায় 0·4%। অর্থাৎ খুবই কম। প্রতি পাউন্ড এই তেল থেকে 15000 BThU শক্তি পাওয়া যায়।

(ii) সাধারণ চাপে এবং বাতাসের অবর্তমানে 500°C-এ উত্তপ্ত করলে কঠিন আবর্জনার অন্তধূর্ম পাতনে গ্যাসীয় ও তরল জ্বালানি উৎপন্ন হয়। যা দিয়ে অন্যান্য যন্ত্র চালানো যেতে পারে। প্রতি টন আবর্জনা থেকে এক ব্যারেল তেল পাওয়া যায়। আর প্রতি পাউন্ড এই তেল থেকে 10,500 BThU শক্তি পাওয়া যায়। এই পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হলো উৎপন্ন গ্যাস ও টার (আলকাতরা)। অবশ্য উৎপাদিত গ্যাস মাধ্যমে আবর্জনাকে উত্তপ্ত করা এবং টারকে পুড়িয়ে যন্ত্রে শক্তি সরবরাহ করা যায়।

(iii) আবর্জনায় উপস্থিত জৈব বস্তুসমূহকে জীবাণু দ্বারা বাতাসের অনুপস্থিতিতে (anacrobic digestion) বিয়োজন করা হয়। যেমনভাবে নর্দমার জলকে পরিশোধন করা হয়। এতে মিথেন গ্যাস পাওয়া যায়। যাকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা চলে। আবর্জনার সঙ্গে জলও উপযুক্ত পারিপোশক (nutrient) দ্রব্য মিশিয়ে কাদার মত পদার্থে পরিণত করা হয়। যাকে 72°C-এ সাতদিন ধরে কোন আবদ্ধ পাত্রে রাখা হয়। এতে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই বায়ো-কনভারসানে অ্যালগি, ফাইটো ফ্যাংটন ইত্যাদি উদ্ভিদকে কাজে লাগানো হয়। এই ব্যাপারটি এখনও পরীক্ষামূলক অবস্থায় আছে।

জৈবভর শক্তি

স্থল, জল এবং অন্তরীক্ষে উৎপন্ন যে কোন উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদজাত পদার্থ ও প্রাণীর বর্জ্য পদার্থসমূহকে বায়োমাস বা জৈবভর বলা হয়। এই জৈবভরের মধ্যে আছে গাছপালা, ঘাস, শস্য, জলজ উদ্ভিদ ও অ্যালগি এবং এই সকল বস্তুর ব্যবহারের পরে যে অবশেষ পড়ে থাকে এবং জীবজন্তুর আবর্জনা যা প্রতিদিন জমা পড়ছে।

বায়োমাস জ্বালানির মধ্যে সর্বপ্রধান হলো কাঠ। অতি প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝ পর্যন্ত এই কাঠই ছিল মানুষের প্রধান এবং প্রায় একমাত্র শক্তির উৎস। কিন্তু কয়লা আবিষ্কারের পর থেকে এই কাঠের ব্যবহার কমে এলেও আজ পর্যন্ত একেবারে বাতিল করা যায়নি, বিশেষত অনুন্নত এবং শিল্পে অনগ্রসর দেশগুলিতে। শক্তির উৎস হিসেবে গত শতাব্দীতে কাঠের স্থান এক নম্বর থাকলেও আজ হটতে হটতে পঞ্চম স্থানে এসে পৌঁচেছে। যেমন—কয়লা, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস ও বায়োগ্যাসের পরের স্থানে আছে কাঠ। তবে জলবিদ্যুৎ এবং পারমাণবিক শক্তির থেকে এখনো আগে আছে!

পৃথিবীর নানান দেশে রান্নার কাজে কাঠ এবং শীতপ্রধান অঞ্চলের ঘরবাড়ী গরম রাখতে কাঠ বা কাঠকয়লা আজও ব্যবহার হয়ে আসছে। জ্বালানি হিসেবে কাঠের ব্যবহারের অনেক অসুবিধা আছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে জ্বালানি হিসেবে কাঠের জোগান দেওয়া প্রায় অসম্ভব। কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে বনাঞ্চল কেটে বসতি স্থাপন করতে হচ্ছে এবং কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত জমির জন্যও বনাঞ্চল সাফ করতে হচ্ছে। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে জ্বালানি ছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনে কাঠের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন কাগজ, প্যাকিং আসবাবপত্র ও বাড়ী তৈরীতে কাঠের চাহিদা প্রচুর বেড়ে যাচ্ছে। অন্যান্য জ্বালানি সস্তায় এবং সহজে পাওয়া যায় এবং প্রাপ্ত জ্বালানি থেকে শক্তি উৎপাদনের ঝামেলা কাঠের থেকে অনেক কম।

কাঠের সুবিধার মধ্যে আছে—(i) অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানি, যেমন অপুনর্নবীভবনযোগ্য, কাঠ কিন্তু পুনর্নবীভবনযোগ্য জ্বালানি। জ্বালানির শেষে উৎপন্ন কাঠের ছাই সমস্যার ব্যাপার নয়, বরং এটি খুব ভালো সার।

তাই অন্যান্য চাহিদার সঙ্গে জ্বালানি হিসেবে কাঠের উৎপাদন বৃদ্ধিতে নতুন বনাঞ্চল সৃষ্টি করতে হবে। এতে যে কেবল শক্তির চাহিদার একটা অংশ মেটানো যাবে শুধু তাই নয়, তাছাড়া অন্যান্য উদ্ভিদজাত বস্তুর উৎপাদনও বাড়ানো যাবে। আর ভূমিক্ষয় রোধ করা যাবে। ফলে বাঁধকে পলির হাত থেকে বাঁচানো যাবে অনেক বেশীদিন। মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়বে, বাড়বে বৃষ্টিপাত।

শক্তির বাহক—হাইড্রোজেন

1847 খ্রীষ্টাব্দে জ্যুলে ভের্ন তাঁর 'The Mysteries Island' বইয়ে হাইড্রোজেনকে শক্তির বাহক বলে উল্লেখ করেছেন। জলের উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এককভাবে বা যৌথভাবে একদিন ব্যবহার করা হবে অফুরন্ত তাপ আর আলো সৃষ্টির উৎসরূপে।

আজকাল জ্যুলে ভের্নের স্বপ্ন নিয়ে অনেকেই মাথা ঘামাতে শুরু করেছেন। ক্রমশ ফুরিয়ে আসা জীবাশ্ম জ্বালানির পরিপূরক হিসেবে হাইড্রোজেন উল্লেখযোগ্য স্থান নিতে পারে। মুক্ত অবস্থায় হাইড্রোজেন পৃথিবীতে খুবই কম পরিমাণে থাকলেও যুক্ত অবস্থায় (যৌগরূপে) ভূত্বকে প্রাপ্তি হিসেবে নবম স্থানে আছে। বেশীর ভাগ হাইড্রোজেন সমুদ্র জলে আছে। হাইড্রোজেন যৌগ বিশেষ করে জলের থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে হাইড্রোজেন প্রস্তুত করা হয়। যাকে সংশ্লেষণ রাসায়নিক জ্বালানি (synthetic chemical fuel) বলে।

জীবাশ্ম জ্বালানি ফুরিয়ে আসার ফলে আগামী দিনগুলিতে আমাদের সৌর, বাতাস, সমুদ্র, ভূতাপ, পারমাণবিক শক্তির উৎসের ওপর নির্ভর করতে হবে। আর এই সব উৎসের শক্তিকে ভালোভাবে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করতে হলে চাই উপযুক্ত শক্তির বাহক (energy carrier)। এ কাজে বিদ্যুৎ বা হাইড্রোজেনের মত সংশ্লেষণের রাসায়নিক জ্বালানি সহজে ব্যবহার করা যায়।

শক্তি বাহকের বিশেষত্ব

(i) আদিম শক্তির উৎস থেকে শক্তির বাহকে রূপান্তরের হার অধিক হওয়া প্রয়োজন। (ii) শক্তি বাহকের পরিবহণ ও বণ্টনের সহজ পদ্ধতি থাকা চাই এবং এর সঙ্গে পরিবহণ বা বণ্টনে শক্তিক্ষয় কম হওয়া চাই। (iii) শক্তিবাহকে রূপান্তরের সহজ পদ্ধতি থাকা চাই এবং রূপান্তরে খরচ কম হওয়া দরকার। (iv) শক্তি বাহককে সহজে, সস্তায় অনেকদিন পর্যন্ত অবিকৃতভাবে সংরক্ষণের পদ্ধতি থাকা দরকার, যাতে শক্তির ক্ষয় অবশ্যই কম হবে। (v) শক্তির বাহককে শিল্পে এবং পরিবহণে ব্যবহারের পদ্ধতি থাকা দরকার। (vi) সংরক্ষণে এবং ব্যবহারে নিরাপত্তা থাকা চাই। (vii) শক্তির বাহকে রূপান্তরে বা শক্তির বাহক থেকে অন্য শক্তিতে রূপান্তরে যথাসম্ভব পরিবেশ কম দূষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিদ্যুৎকে শক্তির বাহক হিসেবে ব্যবহারে অনেক সুবিধা থাকলেও এরও নানান অসুবিধা আছে। যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহণ ও বণ্টনের খরচ প্রচুর। যদিও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন, বণ্টন ও ব্যবহার তুলনামূলকভাবে নিরাপদ। কিন্তু বিদ্যুৎশক্তিকে সংরক্ষণ খুবই খরচ সাপেক্ষ। এই সংরক্ষণ কাজে জল পাম্প করে উঁচুতে অবস্থিত কোন জলাশয়ে তুলে রেখে প্রয়োজনের সময় ঐ জলের স্থিতি-শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পুনরায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। নানা কারণে এই পদ্ধতির দক্ষতা বেশ কম। বিদ্যুৎশক্তি দিয়ে সরাসরি পরিবহণের কাজে ব্যবহারে অনেক অসুবিধা আছে। এই বিদ্যুৎ ছাড়া অন্যান্য শক্তির বাহক তরল বা গ্যাসীয় অবস্থায় থাকা প্রয়োজন এবং এই বাহকের উৎসের প্রাচুর্যতা থাকা প্রয়োজন।

শক্তির বাহক হিসেবে হাইড্রোজেনের প্রয়োজনীয় প্রায় সব গুণই আছে। যেমন এর উৎসের প্রাচুর্যতা আছে—যেমন জল। সে সব শিল্পে কয়লা বা পেট্রোলিয়াম পদার্থ নির্ভর সেই সব শিল্পে হাইড্রোজেন বিকল্প হিসেবে ভালোভাবে ব্যবহার করা চলে। যেমন ইস্পাত শিল্পে এবং অটোমোবাইলে। এছাড়া হাইড্রোজেন দিয়ে মিথানল, হাইড্রাজিন অ্যামোনিয়া ইত্যাদি অন্যান্য জ্বালানি প্রস্তুত করা যায়। হাইড্রোজেন ব্যবহারের প্রধান সুবিধা হলো এই যে এর থেকে পরিবেশ দূষিত হবার মাত্রা খুবই কম। পরিবর্ত জ্বালানি হিসেবে হাইড্রোজেন ব্যবহারে শিল্পের কাঠামো বদলের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু হাইড্রোজেন ব্যবহারের প্রধান অসুবিধা হলো নিরাপত্তার ঝুঁকি আছে।

শক্তির বাহক হিসেবে হাইড্রোজেন বিদ্যুতের থেকে অধিক সুবিধাজনক অবস্থা আছে। হাইড্রোজেনকে সহজে এবং দক্ষতার সঙ্গে শক্তির বাহকে রূপান্তর করা যায়, বিদ্যুতের থেকে পরিবহণ ও সংরক্ষণ খরচ কম। বিদ্যুৎ কিন্তু ব্যবহারের দিক থেকে অনেক বেশী নিরাপদ।

তাপ, বিদ্যুৎ বা রাসায়নিকভাবে জলের বিযোজন ঘটিয়ে হাইড্রোজেন সহজে প্রস্তুত করা যায়। আর পৃথিবীতে জলের ভাণ্ডারটি ব্যাপক। হাইড্রোজেনের পরিবহণ ও সংরক্ষণ সহজ এবং খরচ কম। হাইড্রোজেনকে অক্সিজেন বা বায়ুর সঙ্গে একত্রে দাহ্য জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এতে পুনরায় জল উৎপন্ন হয়। ফলে পৃথিবীতে হাইড্রোজেন উৎপাদন ও শক্তি হিসেবে ব্যবহারের জলের পরিমাণ ঠিক থাকে। বায়ুতে হাইড্রোজেনের দহনে অল্প পরিমাণে নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এটি কেবলমাত্র পরিবেশ দূষিত করতে পারে, যাকে সহজে দূর করা যায়।

বিদ্যুৎ ও হাইড্রোজেনের তুলনা

বৈশিষ্ট্য	বিদ্যুৎ	হাইড্রোজেন
1. শক্তির বাহকে রূপান্তরের দক্ষতা	35-40%	35-50%
2. পরিবহণ, বণ্টন ও সংরক্ষণ	খরচ সাপেক্ষ	খরচ কম
3. বাহককে কাজে লাগানোর পদ্ধতি	শিল্পে ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়, কিন্তু পরিবহণে কাজে লাগাতে অসুবিধা আছে।	শিল্পে ও পরিবহণে সহজে কাজে লাগানো যায়।
4. নিরাপত্তা	নিরাপদ	ব্যবহারে নিরাপত্তার ঝুঁকি আছে।

1933 খ্রীষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী Rudolf A. Even ইংলণ্ডে সর্বাধিক চাহিদার সময় ছাড়া অন্য সময়ে উৎপন্ন অতিরিক্ত বিদ্যুৎশক্তি দিয়ে হাইড্রোজেন উৎপাদন করার পরিকল্পনা করেন। আর উৎপন্ন হাইড্রোজেন দিয়ে মোটরগাড়ী চালাবার চেষ্টা করেন। পেট্রোলের গাড়ী থেকে বার হওয়া কালো ধোঁয়ার থেকে পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষার জন্য এমন চেষ্টা তিনি করেছিলেন। এতে মূল্যবান পেট্রোলিয়ামও সাশ্রয় হতো।

হাইড্রোজেনের পরিবহণ ও বণ্টন

হাইড্রোজেনকে গ্যাসীয় অথবা তরল অবস্থায় পরিবহণ করা যায়। গ্যাসীয় অবস্থায় প্রাকৃতিক গ্যাসের মত পাইপ লাইন দিয়ে পরিবহণ করানো যেতে পারে। এতে পরিবহণ ব্যয় খুবই কম। পাইপ লাইন মাটির নিচ দিয়ে যায় বলে নিরাপদ। তরল হিসেবে হাইড্রোজেনকে পরিবহণ করতে −253°C-এ সর্বদা রাখতে হবে। বিশেষভাবে নির্মিত ট্যাংকারে তরল হাইড্রোজেন পরিবহণ করা যায়। রকেটে বর্তমানে তরল হাইড্রোজেন জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। হাইড্রোজেন পরিবহণের মারাত্মক সমস্যা হলো পাইপ লাইন যে ধাতু বা

ধাতুসংকর দিয়ে প্রস্তুত তার সঙ্গে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় ভঙ্গুর হয়ে যায়। অবশ্য হাইড্রোজেনের সঙ্গে অল্প পরিমাণ অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড বা জলীয় বাষ্প থাকলে ধাতু বা সংকর ধাতু ভঙ্গুর হয়ে পড়ে না।

গ্যাসীয় হাইড্রোজেনের শক্তি আয়তন ঘনত্ব (energy volume density) হলো 325 B Th U/ft^3। সেখানে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় 1025 BThU/ft^3। অর্থাৎ প্রাকৃতিক গ্যাসের মত শক্তি পেতে হলে প্রায় তিনগুণ আয়তন হাইড্রোজেন পাঠাতে হবে।

হাইড্রোজেন ও অন্যান্য শক্তির বাহকের তুলনা

বাহকের বৈশিষ্ট্য	H_2 গ্যাস	তরল H_2	CH_3OH	গ্যাসলিন	CH_4
শক্তির আয়তন ঘনত্ব BThU/ft^3	325	200,000	430,000	830,000	1,025
প্রতি একক ভরের শক্তি BThU/lb	58,000	58,000	9200	19,400	23,000
জ্বলনাঙ্ক °C	585	585	510	257	537

হাইড্রোজেন সংরক্ষণ

শক্তির বাহক হিসেবে হাইড্রোজেনকে গ্যাসীয় অবস্থায় ভূগর্ভের মুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। অথবা নিম্ন তাপমাত্রায় হাইড্রোজেনকে তরল অবস্থায় সংরক্ষণ করা যেতে পারে। ধাতব হাইড্রাইড হিসেবেও হাইড্রোজেনকে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। তবে এই পদ্ধতি বেশ ব্যয় সাপেক্ষ। হাইড্রাইডকে উত্তপ্ত করলে পুনরায় হাইড্রোজেন পাওয়া যায়। ভ্যানাডিয়াম, নায়োবিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম নিকেল, ম্যাগনেশিয়ান কপার বা ল্যান্হানাম নিকেল সংকর ধাতু প্রচুর আয়তনের হাইড্রোজেনকে শোষণ করে রাখতে পারে।

ভূগর্ভের মুক্ত স্থানে যেমন প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চয় করে রাখা হয় ঠিক তেমন ভাবে হাইড্রোজেনকে রাখা যায়। কিন্তু শিলার (পাথরের) মধ্যে হাইড্রোজেনের প্রবেশ্যতা (permeability) সঞ্চয়ের পক্ষে প্রধান বাধা। তরল অবস্থায় হাইড্রোজেনকে বিশেষ ধরনের দুই দেওয়াল বিশিষ্ট ট্যাংকারে রাখা হয় এবং ঐ ট্যাংকারের দুই দেওয়ালের মধ্যবর্তী স্থান বায়ুশূন্য করে বা অন্য কোন তাপ নিরোধক পদার্থ দিয়ে পূর্ণ করা থাকে। তরল অবস্থায় হাইড্রোজেনকে রাখতে গেলে নিম্ন তাপমাত্রা দরকার এবং এই নিম্ন তাপমাত্রা রক্ষা করা বেশ ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার।

জন. এফ. কেনেডি স্পেস সেণ্টারে (John F. Kennedy Space Centre) পৃথিবীর বৃহত্তম তরল হাইড্রোজেনের ট্যাঙ্কার আছে। এতে প্রায় 900,000 গ্যালন তরল হাইড্রোজেন ধরে।

জ্বালানি হিসেবে হাইড্রোজেন

মহাশূন্যে অন্তরিক্ষ যানকে উত্তপ্ত রাখতে হাইড্রোজেনকে সহজে ব্যবহার করা যায়। কারণ হাইড্রোজেনের দহনের ফলে উৎপন্ন পদার্থ (জল) স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। সুতরাং উৎপন্ন পদার্থকে সরানোর জন্য সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না। ঘর গরম করতে হাইড্রোজেন ব্যবহারে ধোঁয়া বা কোন কণার (flue) উৎপন্ন হয় না। ফলে চিমনীর প্রয়োজন হয় না। এতে প্রায় 30% শক্তি অপচয়ের হাত থেকে বাঁচানো যায় এবং central heating-এর প্রয়োজন হয় না। ফলে খরচের অনেক সাশ্রয় হয়। হাইড্রোজেনের দহনের দ্বারা ঘর অনেকক্ষণ গরম থাকে। কারণ এতে ফ্লু থাকে না, ফলে অবাধ বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের (ventilation) প্রয়োজন হয় না। দহনের ফলে উৎপন্ন জলীয় বাষ্প ঘরের আর্দ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

হাইড্রোজেনের অনুঘটকীয় দহন শিখাহীনভাবে করা যায় এবং ঘর গরম করতে ব্যবহার করা যায়।

কয়লা (কার্বন) বা প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে যে সব বিজারণ করা যায় H_2 দিয়েও সেই সব বিজারণ খুবই ভালোভাবে করা যায়। যেমন আয়রন অক্সাইডকে H_2 দিয়ে বিজারণে ধাতব আয়রন প্রস্তুত করা যায়।

ব্যাটারীতে রাসায়নিক শক্তি সরাসরি বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত হয়। সেইরকম হাইড্রোজেন অক্সিজেন সেলে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয় এবং এই সেলের কার্যদক্ষতা খুবই বেশী। এটিকে বেশ ভালোভাবে কাজে লাগানো যায় এবং এটি দূষণমুক্ত। ভবিষ্যতে এই সেলের ব্যবহার নিশ্চয় বাড়বে।

এগুলি ছাড়াও হাইড্রোজেন নানান কাজে লাগে।

অটোমোবাইল জ্বালানি হিসেবে হাইড্রোজেন

মোটরগাড়ীর জ্বালানি হিসেবে হাইড্রোজেনকে সর্বাধিক ব্যবহার করা যেতে পারে। হাইড্রোজেন ব্যবহারে মোটর ইঞ্জিনের সামান্যই পরিবর্তন করার দরকার হয়। তাছাড়া পেট্রোল ব্যবহারে যে পরিমাণ পরিবেশ দূষিত হয় তার অতি সামান্য অংশ H_2 ব্যবহারে হবে। গ্যাসীয় বা তরল H_2 বা ধাতব হাইড্রাইড অটোমোবাইলে

জ্বালানি রূপে ব্যবহার করা যায়। অবশ্য সর্বোত্তম হলো তরল হাইড্রোজেন। অধিকচাপে বা তরল অবস্থায় হাইড্রোজেনকে গাড়ীর ট্যাঙ্কে রাখতে গেলে ট্যাংককে বিশেষভাবে নির্মাণ করতে হয় এবং এদের ওজনের একটা সমস্যা আছে।

গ্যাসোলিনের থেকে হাইড্রোজেনের জ্বলনশক্তি (ignition energy) অনেক কম। ফলে মোটর ইঞ্জিনের অল্পস্বল্প পরিবর্তন করে কাজ চালানো যেতে পারে। হাইড্রোজেনের জ্বলনশক্তি কম হওয়ায় একটা অসুবিধাও আছে। যেমন স্থির বিদ্যুৎ মোক্ষণে (static electric discharge) হাইড্রোজেন জ্বলে উঠতে পারে। ফলে ব্যবহারে নিরাপত্তা কম। বাতাসে হাইড্রোজেনের ব্যাপন খুব তাড়াতাড়ি হয়। ফলে খুব তাড়াতাড়ি বাতাসে মিশে যেতে পারে। এতে দাহ্যমিশ্রণে (combustible mixture) পরিণত হতে পারে না। সেই দিক থেকে হাইড্রোজেন ব্যবহার অনেক নিরাপদ।

তরল হাইড্রোজেনও মোটর গাড়ীতে ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে অসুবিধা হলো নিম্নতাপ রক্ষা করা। অবশ্য হাইড্রোজেনর উৎস হিসেবে ধাতব হাইড্রাইড ব্যবহার করা চলে। এক্ষেত্রে প্রধান অসুবিধা হলো ওজন। কারণ 300 কেজি হাইড্রাইড থেকে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন পাওয়া যায় তা প্রায় বাইশ গ্যালন গ্যাসোলিনের সমতুল্য, যার ওজন মাত্র 75 কেজি।

হাইড্রোজেনকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারে বায়ুদূষণ হয় না বললেই চলে। কেবলমাত্র অধিক তাপমাত্রায় বাতাসের নাইট্রোজেন অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় নাইট্রোজেনের অক্সাইড উৎপন্ন করে। যা পেট্রোলইঞ্জিন থেকে যে হাইড্রোকার্বন বার হয় তার সঙ্গে ধোয়াসা সৃষ্টিতে অনুঘটকের কাজ করে।

সুপারসোনিক জেটের গ্যাসটারবাইন ইঞ্জিনের জন্য তরল হাইড্রোজেন ব্যবহার প্রস্তাবিত হয়েছে। এক্ষেত্রে মস্ত সুবিধা হলো সমপরিমাণ অন্যান্য তরল জ্বালানির থেকে হাইড্রোজেনের ওজন অনেক কম। এতে জেটের আকার ও কার্যদক্ষতা অনেক বেশী রক্ষা করা যেতে পারে।

কার্বন মনোক্সাইড এবং হাইড্রোজেন দিয়ে মিথানল প্রস্তুত করা যেতে পারে। যাকে তরল জ্বালানি হিসেবে মোটরগাড়ীতেও ব্যবহার করা চলে।

হা ই ড্রো জে ন প্র স্তু তি

জলের তড়িৎ বিশ্লেষণে তুল্যাংক পরিমাণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন প্রস্তুত করা যায়। বিদ্যুৎ উৎপাদনে সৌরশক্তি, ভূতাপশক্তি, বাতাসের শক্তি বা পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করা যায়।

হাইড্রোজেন প্রস্তুতিতে আগে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রয়োজন এবং উৎপন্ন বিদ্যুতের প্রায় 2/3 অংশ হাইড্রোজেন উৎপাদনে নষ্ট হয়ে যায়। তড়িৎ বিশ্লেষণে জলের মধ্যে নিষ্ক্রিয় তড়িৎদ্বারের সাহায্যে তড়িৎ প্রবাহিত করা হয়। জল তড়িতের সুপরিবাহী নয় বলে তড়িৎ বিশ্লিষ্ট পদার্থ কস্টিক সোডা জলে যোগ করা হয়। হাইড্রোজেন উৎপাদনে তুল্যাংক পরিমাণ অক্সিজেনও উৎপন্ন করা হয়। ক্যাথোডে হাইড্রোজেন এবং অ্যানোডে অক্সিজেন মুক্ত হয়।

তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে জলকে বিয়োজন করতে শক্তির পরিমাণ কম লাগে। জলের তড়িৎ বিশ্লেষণের কর্মদক্ষতা প্রায় 60—90%।

বদ্ধ চক্র তাপ রাসায়নিক পদ্ধতির (closed cycle thermo chemical method) সাহায্যে জলকে প্রত্যক্ষভাবে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিয়োজিত করা যায়। এটি তড়িৎ বিশ্লেষণের থেকে অনেক ভালো এবং বিদ্যুৎকে বিশ্লেষণে ব্যবহার না করে তাপ উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়।

হাইড্রোজেনের শিল্পোৎপাদনে এই পদ্ধতি এখনও চালু হয়নি।

লোহিততপ্ত লোহার সঙ্গে জলীয় বাষ্পের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন উৎপাদন করা যায়। লোহাকে উত্তপ্ত করতে কয়লা ব্যবহার করা হয় এবং উৎপন্ন ফেরোসোফেরিক অক্সাইডকে বিজারিত করতে কার্বন মনোক্সাইড ব্যবহার করা হয়, যা কয়লা থেকে উৎপাদন করা যায়।

$$\text{আয়রন} + \text{জলীয় বাষ্প} \xrightarrow{\text{উত্তপ্ত}} \text{ফেরোসোফেরিক অক্সাইড} + \text{হাইড্রোজেন}$$

এছাড়া প্রাকৃতিক গ্যাসের মিথেনকে উচ্চতাপমাত্রায় বিয়োজিত করে হাইড্রোজেন প্রস্তুত করা যেতে পারে। পেট্রোলিয়াম পদার্থ থেকেও হাইড্রোজেন উৎপাদন করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট

1 জ্বল $= 10^7$ আর্গ

1 ক্যালোরি $= 4{\cdot}18$ জ্বল $= 4{\cdot}18 \times 10^7$ আর্গ

1 ওয়াট = এক জ্বল/সেকেণ্ড

1 কিলোওয়াট = 1000 ওয়াট = 738 ফুট পাউণ্ড/সেকেণ্ড
= 1·3415 অশ্বশক্তি

1 অশ্বশক্তি = 550 ফুট পাউণ্ড/সেকেণ্ড = 33000 ফুট পাউণ্ড/মিনিট
= 745·7 ওয়াট = 0·707 B. Th. U/ সেকেণ্ড

1 B. Th. U = 1054 জ্বল = 252·15 ক্যালোরী = 0·25215 কিলো ক্যালোরি = 778·4 ফুট পাউণ্ড = 0·000293 কিলোওয়াট ঘণ্টা (KWh)

1 কিলোওয়াট ঘণ্টা $= 1000 \times 60 \times 60$ ওয়াট/সেকেণ্ড $= 3{\cdot}6 \times 10^6$ ওয়াট/সেকেণ্ড

1 মেগাওয়াট (MW) $= 10^6$ ওয়াট

1 গিগাওয়াট (GW) $= 109^9$ ওয়াট

1 টেরাওয়াট (TW) $= 10^{12}$ ওয়াট

1 কোয়াড (quard=quadrillon) $= 10^{15}$ B. Th. U.

1 এক্সাজ্বল (exajoule) $= 10^{18}$ জ্বল = 0·948 কোয়াড

1 ব্যারেল = 42 গ্যালন

7·14 ব্যারেল (ব্রিটিশ) = 1 টন

বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা

১. সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস (২য় মুঃ) : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৬.০০
২. ঈশ্বর-সন্ধানে : প্রবাসজীবন চৌধুরী ৩.৫০
৩. বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় (৩য় সং) : অতুল সুর ৬.০০
৪. রামকথার প্রাক-ইতিহাস : সুকুমার সেন ......
৫. অর্থনীতির পথে : ভবতোষ দত্ত ৫.০০
৬. বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্ম (২য় মুঃ) : প্রিয়দারঞ্জন রায় ৮.০০
৭. কলিকাতায় বিদ্যাসাগর (২য় মুঃ) : রাধারমণ মিত্র ৫.০০
৮. উপসর্গের অর্থবিচার : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫.০০
৯. ভারতে মূলধনের বাজার : অতুল সুর ৪.৫০
১০. স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা : রাজ্যেশ্বর মিত্র ......
১১. ভারতীয় দর্শন : হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ৭.৫০
১২. বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর (২য় সং) : অতুল সুর ৮.০০
১৩. ভারতে ইতিহাস রচনা-প্রণালী : রমেশচন্দ্র মজুমদার ও কল্যাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ......
১৪. শব্দের জগৎ : পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য ৬.০০
১৫. কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি (২য় মুঃ) : নীহাররঞ্জন রায় ৪.৫০
১৬. চারশ' বছরের পাশ্চাত্য দর্শন : উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ৭.০০
১৭. শিক্ষার রূপকথা : শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য ৪.০০
১৮. উত্তর শরৎ বাংলা উপন্যাস (২য় মুঃ) : নারায়ণ চৌধুরী ৭.৫০
১৯. সিন্ধুসভ্যতার স্বরূপ ও অবদান : অতুল সুর ৩.৫০
২০. আকাশের কথা : শঙ্কর চক্রবর্তী ৪.০০
২১. রোগ, রোগী ও পথ্য : ডা. সমর রায়চৌধুরী ৭.৫০
২২. ভারতের জনসংখ্যা : অতীন্দ্রমোহন গুণ ৭.০০
২৩. সুফী মতের উৎস-সন্ধানে : পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য ৬.০০

২৪.	বিজ্ঞানভিত্তিক পরিচালনা ঃ ভূপাল দত্ত	৬·০০
২৫.	মুদ্রণ শিল্পের গোড়ার কথা ঃ যোগেশচন্দ্র বাগল	৬·০০
২৬.	নদী ঃ সুপ্রিয় সেন	৫·০০
২৭.	বাঙালী লেখকের রায়তচিন্তা ঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	৫·০০
২৮.	দুঃখ-জরা ঃ বসন্ত ঘোষাল	৭·০০
২৯.	বাঙলার লোকবৃত্ত ॥ আধুনিক ভাবনা ঃ শঙ্কর সেনগুপ্ত	১২·০০
৩০.	রোগনির্ণয় পদ্ধতি ঃ ডা. শ্রীকুমার রায়	৮·০০
৩১.	শক্তির উৎস ঃ কানাইলাল মুখোপাধ্যায়	১০·০০

শক্তির চাহিদা এবং হাহাকার এখন পৃথিবীব্যাপী। বিনা শক্তিতে কোনো কাজ হবার উপায় নেই। কিন্তু, শক্তি পাওয়া যায় কী কী ভাবে? পৃথিবীতে শক্তির উল্লেখযোগ্য উৎসগুলো কী? দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিদ্যুৎ এবং তাপশক্তিই দৃশ্যত বেশী ব্যবহার করি। শক্তির অন্যান্য রূপ সম্পর্কে যেমন আমরা সব সময়ে সচেতন থাকি না, তেমনি—শক্তির বহুবিচিত্র উৎসগুলোও সচরাচর আমাদের চোখের আড়ালে থেকে যায়। এই বইতে শক্তির নানা উৎসের উল্লেখ এবং পরিচয় পাঠক পাবেন সহজবোধ্য ভাষায়। উৎসগুলো থেকে শক্তি গ্রহণ করবার প্রকৌশলগত দুর্বোধ্যতা এবং জটিলতায় পাঠককে আচ্ছন্ন না ক'রে অধ্যাপক শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর অভিজ্ঞ লেখনী দিয়ে পাঠককে নিয়ে গিয়েছেন শক্তির বিচিত্র উৎসলোকে। এত অল্প পরিসরে এত তথ্যের উল্লেখ এবং বিষয়গত পূর্ণতা রক্ষা এই বই-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মূল্য : নয় টাকা